শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এযাবৎ দু'লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে আই এস
— পৃ: ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

অলীক একনায়ক নরেন্দ্র মোদী
— পৃ: ২৭

৬৮ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ১২ অক্টোবর ২০১৫।। ২৪ আশ্বিন - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

নাসিকে অমৃতকুম্ভ
বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সন্ধান

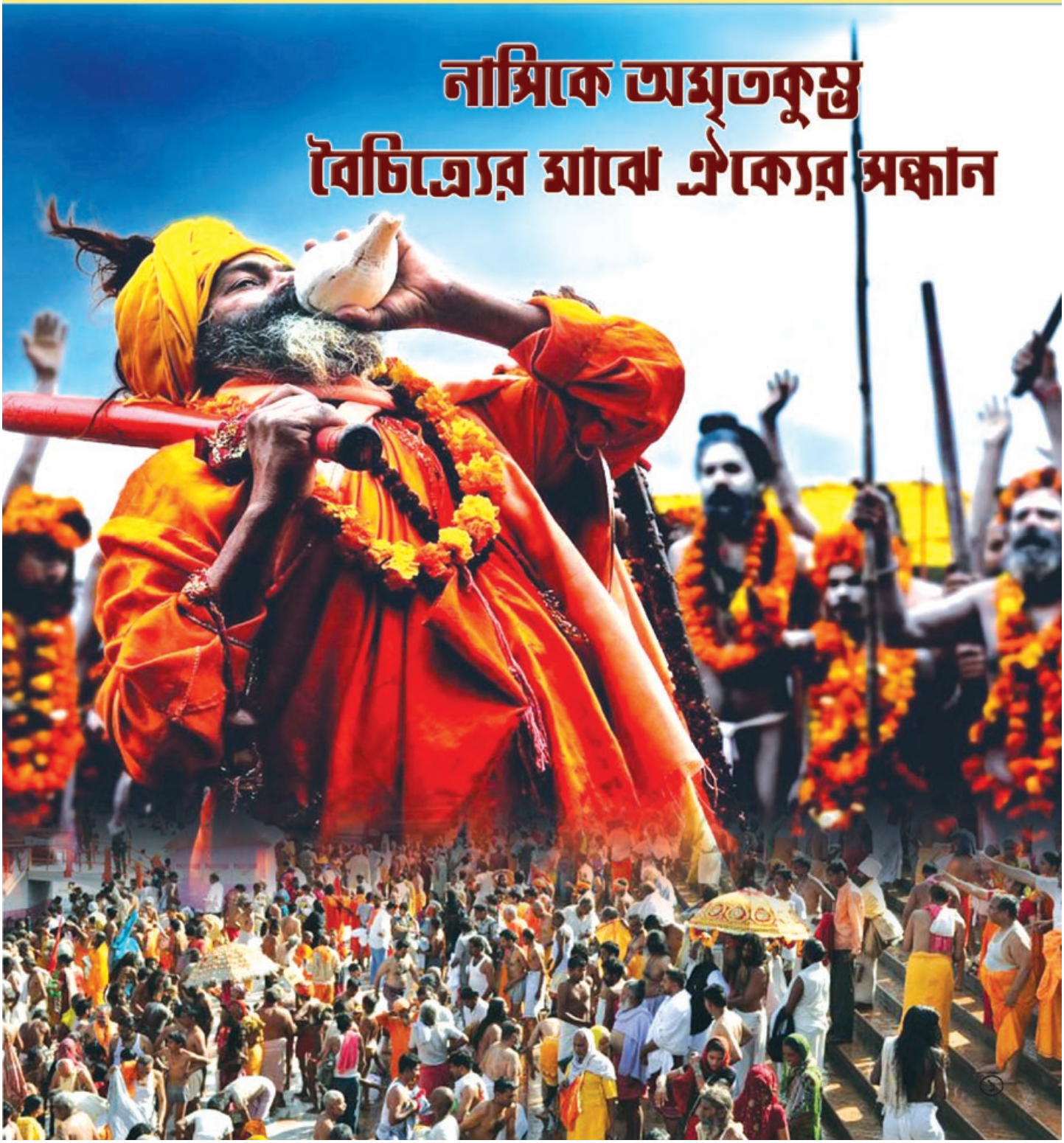

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১২ অক্টোবর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াজগতেও মমতায়ন শুরু হয়েছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : গোটা দেশকে আপনি কাঁদালেন মোদী □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এযাবৎ দু'লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে আই এস □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১২

নাসিক অমৃতকুম্ভে □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৪

অমৃতযাত্রা □ ন. কু. ভ. □ ১৬

দেবী চণ্ডীর মানসপুত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র □ সুতপা বসাক ভড় □ ১৮

হিন্দুত্ববাদীরা কী ভীরু নাকি উদাসীন? □ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী □ ২০

কালাত্মক পরমেশ্বরী দুর্গা □ স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ □ ২১

আনন্দময়ী-জননী মোক্ষদাসুন্দরী □ রূপশ্রী দত্ত □ ২৩

অলীক একনায়ক নরেন্দ্র মোদী □ সদানন্দ ধুমে □ ২৭

সাক্ষাৎকার : দুর্বলতম অংশকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়েই দেশ উন্নয়নের পথে এগোবে : ভাগবত □ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

বনেদি বাড়ির পুজো

বঙ্গজীবনে দুর্গাপূজা অন্য সুর আর ছন্দ নিয়ে আসে। এই উৎসবের জন্য সারা বছর ধরে চলে প্রতীক্ষা। বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিও চলে সারা বছর ধরে। নিয়মনিষ্ঠা ও আচার আঙ্গিকে এই পুজোগুলি এখনও অনন্য। এই প্রসঙ্গেই এবারের বিষয়।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

বিরোধীশূন্য রাজত্ব গঠনের অপপ্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী নেত্রী থাকিবার কালে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব গণতান্ত্রিক কথা বলিয়া বিপুল জনসমর্থনে মসনদ লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি রাজ্যটিকে গুণ্ডা-বদমায়েশ ও চোর-জোচ্চোরের আখড়ায় পরিণত করিয়াছেন। রাজ্যবাসীর তাঁহার কাছে যে প্রত্যাশা ছিল তিনি তাহার কণাটুকুও পূরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। মানুষ তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিল এইজন্য যে তিনি সিপিএমের গুণ্ডারাজের অবসান ঘটাইয়া সুস্থির শান্তিময় সমাজ ফিরাইয়া আনিবেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কার্যক্ষেত্রে তিনি হইয়াছেন তাহাদেরই মক্ষিরাণী। একদা সুনন্দ স্যান্যাল, বিভূতি নন্দীরা বিধাননগরের ভোটে বহিরাগতদের তাণ্ডব ঠেকাতেই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সিপিএমের বিরুদ্ধে যাহা গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আজ তৃণমূল জামানায়ও বিধাননগরে বহিরাগতদের তাণ্ডব বন্ধ হয় নাই, বরং তৃণমূল দলের পরিকল্পনায় সমগ্র রাজ্যে তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে। ভোটের নামে প্রহসন আজও চলিতেছে। পুলিশ এবং রাজ্যনির্বাচন কমিশনের শাসকদলের প্রতি আনুগত্য সিপিএম রাজত্বের মতোই রহিয়াছে। তাহা হইলে আর কিসের পরিবর্তন? পরিবর্তন যে হয় নাই তাহা বলা যাইবে না, চোরেদের নেতা বদল হইয়াছে আর চৌর্যবৃত্তির রঙ বদল হইয়াছে মাত্র। পুলিশের আনুগত্য বদল হইয়াছে, গুণ্ডা-বদমায়েশ লুম্পেনরা লাল জামা পাল্টাইয়া সবুজ জামা পরিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়নের বদলে মমতায়ন হইয়াছে। সেইদিনের মার্কসবাদী আদর্শে অনুগত ছাত্ররা আজ তৃণমূলী দর্শনে বাজার মাত করিতেছেন। সেইদিনের জ্যোতি বসুর স্নেহধন্য সাংবাদিকও আজ মমতার স্নেহধন্য হইয়াছেন। বস্তুত সিপিএম যেইখানে শেষ করিয়াছে তৃণমূল সেইখান হইতেই আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সিপিএম রাজত্বে সিপিএম নেতৃবৃন্দ যাহা যাহা কথা বলিতেন আজ তৃণমূল নেতারাও একই কথা বলিতেছেন। যেমন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সিপিএম আকাশ-বাতাস মুখরিত করিত, আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহা করিতেছেন। রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে সিপিএম যেভাবে বক্তব্য রাখিত আজ তৃণমূল সরকারও একই ব্যবহার করিতেছে। সিপিএম বিরোধীশূন্য রাজত্ব গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তৃণমূলও বিরোধীশূন্য রাজত্ব গঠনের উদ্যোগ লইতেছে। সাম্প্রতিক পুরনির্বাচনের ঘটনায় যেভাবে শাসকদলের অপ্রতিহত প্রতাপ দেখা গিয়াছে তাহাতে এই প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিরোধীশূন্য পরিস্থিতিই তৃণমূল কংগ্রেসের বাঞ্ছিত তাহা আজ পরিস্ফুট হইতেছে। কিন্তু বাস্তব হইল বিরোধীশূন্য রাজত্ব চালাইতে যাইয়া সিপিএম নির্মূল হইয়াছে, তৃণমূলও ভবিষ্যতে নির্মূল হইবে। রাজ্যবাসীর ভবিতব্য হইল সিপিএম নামক পাপকে চৌত্রিশ বছর ধরিয়া ভোগ করিতে হইয়াছিল, তৃণমূলকে কত বছর ধরিয়া সহ্য করিতে হইবে তাহা রাজ্যের মানুষকেই ঠিক করিতে হইবে। শত অত্যাচার করিয়াও সিপিএম তাহাদের রাজত্ব ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তৃণমূলও তাহা পারিবে না। মা-মাটি-মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা মানুষ বেশিদিন সহ্য করিবে না। তৃণমূলেরও পতন শুরু হইয়াছে। এখন সময়ের অপেক্ষা।

সুভাষিতম্

বিজেতব্য লঙ্কা চরণতরণীয়ো জলনিধিঃ
বিপক্ষ পৌলস্ত্যো রণভূবি সহায়শ্চ কপয়ঃ।
তথাপ্যেকো রামঃ সকলমবধীদ্ রাক্ষসকুলম্
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।।

পদব্রজে সাগর পার করে শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র বানরদের সঙ্গে নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ রাবণ ও রাক্ষসদের যুদ্ধে হারিয়ে লঙ্কা জয় করেন। যথেষ্ট উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও মহান লোকেরা এভাবেই কাজে সাফল্য লাভ করেন।

সরকারের মুদ্রা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মহিলাদের উদ্যোগগুলি বিপুল সাফল্যের মুখ দেখেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এনডিএ সরকারের কিছুদিন আগে ঘোষিত মুদ্রা ব্যাঙ্ক গঠনের ঘোষণায় ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রের স্বনিযুক্তিতে উৎসুক মহিলারা বিশেষভাবে সাড়া দিচ্ছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপ্রিল ২০১৫ থেকে অক্টোবর ২০১৫-এর মধ্যে মুদ্রা ব্যাঙ্ক চমকপ্রদভাবে দেশের ৪২ লক্ষ ঋণগ্রহীতাকে ২৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে শুধু সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই রয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ যা দেওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ ঋণগ্রহীতাকে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিম দিল্লীর তিলকনগরের পোশাকের দোকান 'রজনী' সংবাদমাধ্যকে জানিয়েছে যে তার

নিজস্ব পোশাকের সম্ভারের জন্য পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছে এবং তা কোনো আলাদা টাকা পয়সা বা বন্ধক ছাড়াই। ঠিক এরকমই উৎসাহের কথা ধরা পড়েছে দিল্লীর উপকণ্ঠে থাকা শ্রীমতী কমলাদেবীর কথায়। তিনি আইডিবিআই থেকে দু'টি গোরু কেনার অর্থের মঞ্জুরী পেয়েছেন। গ্রামীণ মেয়েদের কোচিং ক্লাস চালানো তরুণী নিশা তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষাদান আরও জোরদার ও সম্প্রসারণ করতে ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য এক কথায় পেয়েছেন। হাজার হাজার ঋণগ্রহীতার থেকে নমুনা হিসেবে মাত্র তিন জনের উদাহরণ দেওয়া হলো। তরুণ উদ্যোগপতিদের প্রয়াসকে মজবুত করতে এনডিএ সরকারের এই সিকিউরিটি-হীন সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে।

বিউটি পার্লার থেকে শুরু করে পোশাকের ছোট দোকান, হাতে তৈরি বিশেষ ডিজাইনের পোশাক, মোবাইলের যন্ত্রপাতি থেকে অনেক মহিলারা তাঁদের স্বামীদের জন্য সাইকেল পর্যন্ত কেনবার সাহায্য ব্যাঙ্ক থেকে পাচ্ছেন। সরকার ব্যাঙ্কগুলির ওপর চড়া লক্ষমাত্রা ধার্য করার ফলে ব্যাঙ্কগুলি গত সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ ক্যাম্পেন চলাকালীন রেকর্ড ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে। মুদ্রা ব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনায় বিশেষ সুবিধা নিচ্ছেন দেশের মহিলারা। তাঁদের উৎসাহ ও সাফল্য দেখে সরকার আগামী মার্চ ২০১৬ অবধি ঋণের লক্ষ্য মাত্রা ১ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা ধার্য করেছে।

সরকার সমীক্ষা (এনএসএসও) করে দেখেছে এই ধরনের উদ্যোগগুলিতে সাধারণত মালিক-সহ দু'জন কর্মরত থাকেন আর সংস্থাগুলির asset বা সম্পদের পরিমাণ হয় ২ লক্ষ টাকা। এদের ৩০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষেত্রে, ৩৪ শতাংশ সার্ভিস সেক্টরে আর ৩৬ শতাংশ ট্রেডিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত। মুদ্রা ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য এই ছোট উদ্যোগপতিরাই। এদের মধ্যে যাদের কোনো না কোনো বিষয়ে কিছুটা অন্তত প্রশিক্ষিণ রয়েছে তারা বিপুল উদ্যোগে স্বনির্ভর প্রকল্পগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ও ব্যাঙ্কের যথাযথ সাপোর্ট পাচ্ছেন বলে খবর।

লালুর জাতভাই-ই লালুকে ধিক্কার দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গো-মাংস খাওয়া ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতির সুযোগে রাজনীতি করতে গিয়ে চারা ঘোটালায় সাজাপ্রাপ্ত আর জে ডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব পাটনায় এক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে খবরের মধ্যে থাকতে চাইছেন। লালু বলেছেন, হিন্দুরাও গো মাংস খেতো। এই খবরে বেজায় চটেছেন তাঁরই আত্মীয় বিজেপি সাংসদ হুকুমদেও নারায়ণ যাদব। ৫ বারের প্রবীণ সাংসদ হুকুমদেও জানান লালুর এই বক্তব্য যদুবংশীয়দের (যাদবদের) পক্ষে ঘোর অপমানজনক। তিনি বলেন, যাদবদের কাছে গোরু অত্যন্ত পবিত্র একটি প্রাণী যা মাতৃস্বরূপা।

৭৫ বছরের প্রবীণ মধুবনীর এই সাংসদ বলেন, লালুপ্রসাদ তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে একটি ঘোর সামাজিক অপরাধ করেছেন। লালু তাঁর বক্তব্য ও অভিমত ব্যক্তিগত স্তরে অবশ্যই রাখতে পারেন। তিনি নিজে মনে করলে তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী গো মাংস ভক্ষণও করতে পারেন বা কাউকে খাওয়াতেও পারেন। এ অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু সমগ্র হিন্দু জাতির বা তাঁর নিজের স্বজাতির মুখপাত্র সেজে নিজের ব্যক্তিগত মত ঘোষণার কোনো এক্তিয়ার তাঁর নেই। তিনি গর্হিত কাজ করেছেন। যাদব সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কখনই তা মেনে নেবেন না।

অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হুকুম নারায়ণ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, হিন্দুরা বিশেষ করে যাদব সম্প্রদায় গোরুকে আজীবন পবিত্র বলে মনে করে। তারা নরকে চলে যেতেও রাজি কিন্তু গোরুর মাংস ভক্ষণ নৈব নৈব চ। প্রবীণ এই বিজেপি নেতা ও সাংসদ সম্প্রতি দাদরির দুঃখজনক ঘটনায় একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লালুর এই ঘৃণ্যরাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার কল্পে নিয়োজিত ডিম্‌ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানকে আইআইটি, এইমস্‌-এর মতো 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' (ইন্সটিটিউশন অফ ন্যাশনাল ইমপোরটেন্স) -এর স্তরে উন্নীত করার চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্র সরকার। এর ফলে দিল্লীস্থিত সংস্থানের মুখ্য কার্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে নতুন ক্যাম্পাস, গবেষণাকেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার স্বাধীনতা পাবে। যদিও ইতিমধ্যেই দিল্লীসহ ১১টি ক্যাম্পাস রয়েছে যেখানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লিট স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত পড়ানো হয় এবং সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করা হয়। এছাড়াও সংস্থান বর্তমানে ১০০টি সংস্কৃত মাধ্যমের পাঠ্যশালা পরিচালনা করছে। সূত্রের খবর, গত ইউপিএ

আমলে সত্যব্রত শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ জন সদস্যের একটি কমিটি গড়া হয়েছিল। গত আগস্ট মাসে এই কমিটি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে তাদের অনুমোদনটি পেশ করে। তবে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্‌ কমিশনের ২০১০ -এর নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ডিম্‌ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্বাধিক ৬টি ক্যাম্পাস বানাতে পারে। তাই গত সেপ্টেম্বরে আগরতলায় এর ১১তম ক্যাম্পাস অনুমোদন দেওয়া নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অনুমোদনের মনোনয়ন পেশের আগেই এর ১০টি ক্যাম্পাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সংস্থান সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে ১২তম ক্যাম্পাসটি বানানোর জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছে এবং নিয়মানুযায়ী রেগুলেটরের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। প্যানেলের সদস্য এবং মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে ডিম্‌ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মিললে সংস্থানের গবেষণাধর্মী কাজ, আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় সংস্কৃত শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃত প্রবর্তনের কাজ আরোও সহজ হবে।

বিজ্ঞান-চর্চায় সংস্কৃত অপরিহার্য : রিপোর্ট সংস্কৃত কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংস্কৃত ভাষার মর্যাদা পুনরুদ্ধারে নজিরবিহীন উদ্যোগ নিল দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশন। একথা অনস্বীকার্য যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ব্যতীত প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন কোনোকিছুই জানা সম্ভব নয়। তাই সংস্কৃতকে অস্বীকার করে, তার গায়ে 'মৃত ভাষা'র তকমা এঁটে আমরা আসলে ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছিলাম বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই অবস্থা পাল্টাতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো সুপারিশে দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশন বলেছে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে একটি বিশেষ গবেষণাগার প্রস্তুত করা দরকার যেখানে বিজ্ঞানী ও সংস্কৃত ভাষাবিদেরা একসঙ্গে কাজ করবেন। কেন এই অভিনব উদ্যোগ? প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের শক্তিতে বৃষ্টিপাত হোত এবং যজ্ঞভস্ম মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যেত। এহেন নানা ঐতিহাসিক সত্যকে এতদিন আজগুবি কিংবা অলৌকিক তকমা দিয়েই ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা হয়েছে। এই অনৈতিহাসিক গতানুগতিকতার ভিত্তিমূলে আঘাত আনতেই দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশনের এই উদ্যোগ।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৬ সালে প্রথম সংস্কৃত কমিশন গঠনের দীর্ঘ ৫৮ বছর পর দ্বিতীয় ইউপিএ জমানায় একেবারে অন্তিম প্রান্তে পদ্মভূষণ সত্য বিরাট শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি প্যানেল গড়ে দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশনের সূচনা হয়। তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, সংস্কৃত ভাষা নিয়ে সরকারি উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এর জনপ্রিয়তা ও জনসচেতনতার ক্রমে বাড়ার ইঙ্গিত পেয়ে তৎকালীন কেন্দ্র সরকার ১৩ সদস্যের দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশন গড়তে একপ্রকার বাধ্য হলেও সে বিষয়ে কোনো দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা তাদের ছিল না। কিন্তু জমানা বদলাতে দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশনের কাজে গতি আসে। এই কমিশন চার-ভাষা শিক্ষার পরিকল্পনা লাগু করতে ইচ্ছুক। যেখানে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দশমশ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়-স্তরে সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথা বলা হয়েছে। খুব গুরুত্ব দিয়েই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক দ্বিতীয় সংস্কৃত কমিশনের সুপারিশগুলো বিবেচনা করছে। কমিশনের সুপারিশের মধ্যে এও রয়েছে যাতে সমস্ত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। কারণ প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও কৌশলকে অনুধাবন করতে সংস্কৃতে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে তাঁরা মনে করছেন।

কমিশন তার রিপোর্টে এও উল্লেখ করেছে যে বর্তমানে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপত্য ও নগর-পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞান চর্চায়, আই আইটি, আই আই এম-এর মতো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষা দিয়ে থাকে। ফলে ভারতীয় ছাত্ররা তাদের পূর্বপুরুষদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার কথা কিছুই জানতে পারছে না। তাই সংস্কৃত ভাষার আশু প্রত্যাবর্তন দেশের ঐতিহ্য রক্ষার খাতিরেই একান্ত দরকার বলে কমিশনের বক্তব্য।

ইবিসি এবার বিজেপি-র পক্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টর' হতে চলেছে ইবিসি (এক্সট্রিম্‌লি ব্যাকওয়ার্ড কাস্টস্) অর্থাৎ অতিরিক্ত পিছিয়ে পড়া জাতির ভোট। দেখা যাচ্ছে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে মোদীর উন্নয়নে আস্থা রাখতে চাইছে। উচ্চবর্ণ ও দলিতদের মিলিত ভোট যদি বিজেপি-র পক্ষে যায় এবং অপরদিকে মুসলমান, যাদব, কুর্মীদের ভোট যদি মহাজোটের অনুকূলে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ইবিসি ভোট 'ক্রুসিয়াল রোল প্লে' করবে। ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে অভূতপূর্ব ফল করেছিল তার নেপথ্যেও ছিল শতাধিক ভিন্ন জাতপাতের ভোটপ্রাপ্তির অঙ্ক। এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো গত লোকসভা নির্বাচনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিঁড়িতে উঠতে চেয়ে তাদের অমূল্য ভোট ভেট দিয়ে মোদীজীকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়েছে। বিহারের উন্নয়নের জন্য যিনি সড়ক বানিয়েছেন, অতিরিক্ত পিছিয়ে পড়া জাতিদের মধ্যে যেমন 'সাও' প্রভৃতিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই পিছিয়ে পড়া বা অতিরিক্ত পিছিয়ে পড়া মানুষেরা কেন নীতিশ কুমারকে ছেড়ে মোদীজীর দিকে ঝুঁকছে, এ প্রসঙ্গে বিহারের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী শৈবাল গুপ্তা মনে করেন যে ইবিসিদের মধ্যে সামান্য হাতের কাজ জানা শ্রেণীর মানুষরাও উন্নয়নের জন্য উচ্চাভিলাষী।'

রামমন্দির নির্মাণের আইনি অধিকারের আর্জি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামমন্দির নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে আইনি বাধা দূর করার আর্জি জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সরকারকে তারা জানিয়েছে আগামী এক বছরের মধ্যে সমস্ত বাধা দূর করে মন্দির নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক এবং মন্দির নির্মাণের আইনি অধিকার দেওয়া হোক শ্রীরাম জন্মভূমি ন্যাস-কে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উপদেষ্টা অশোক সিঙ্ঘল এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন— 'সন্ত সমাজের প্রচেষ্টায় শ্রীরাম জন্মভূমি ন্যাস মন্দির নির্মাণের জন্য তিন লক্ষ পাথর আগেই তৈরি করে রেখেছে, সেজন্য মন্দির নির্মাণের আইনি অধিকার তাদেরকেই দেওয়া উচিত এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় মাথায় রেখে সরকার মসজিদ নির্মাণের জন্য অন্য কোনো জায়গা দেখুক।'

অশোক সিঙ্ঘলের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী বলেন— আইনি দিক থেকে মন্দির নির্মাণে কোনো বাধা নেই। তাই সরকার মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করতেই পারে। এ বিষয়ে আরো চিন্তা ভাবনার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আগামী ১০ জানুয়ারি সমস্ত হিন্দু সংগঠন ও সন্ত সমাজকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের আহ্বান করেছে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে জার্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লীর মাটিতে অ্যাঞ্জেলা মার্কেল-এর অবতারণের পর থেকেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত-জার্মান বিতর্কের অবসান হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে জার্মান ভাষা পড়ানোর অভিযোগ ওঠার পর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও গথ (জার্মান) ইনস্টিটিউটের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ পুনর্নবীকরণ করতে অসম্মত হয়েছিল ভারত সরকার। তবে মার্কেলের ভারত সফরের মধ্যেই ভারত ও জার্মানির মধ্যে সংস্কৃত জার্মান ভাষা নিয়ে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে এবার থেকে চতুর্থ অতিরিক্ত ভাষা (বিদেশি ভাষা) হিসাবে যেমন জার্মান ভাষা পড়া যাবে, তেমনই জার্মানিও সম্মত হয়েছে তাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল ও মালায়ালম্ ভাষাও শেখানো হবে। সূত্রের খবর, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও গথ ইনস্টিটিউটের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হবে।

গো-পালনে উৎসাহী মুসলমানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংখ্যালঘুদের নিয়ে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য গঠিত সংগঠন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ (এম আর এম) গো-পালনকারী মুসলমানদের সংবর্ধনা দেবে বলে জানিয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে মুসলমানদের ব্যবস্থাপনায় ১০টি গো-পালক কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। 'গৌ ঔর ইসলাম' (গোরু এবং ইসলাম) শীর্ষক একটি পুস্তিকাও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। ওই বইটিতে গোরুর গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন ইসলাম মতাবলম্বী উলেমাদের লেখা প্রবন্ধ রয়েছে। মুসলিম গো-পালক সম্মেলন প্রথম সংঘটিত হয়েছিল ১৩ সেপ্টেম্বর হরিয়ানার মেওয়াট জেলায়। এই সম্মেলনে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর এবং অল ইন্ডিয়া ইমাম কাউন্সিলের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াস এবং এম আর এম-এর মার্গদর্শক ইন্দ্রেশ কুমারও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটিতে ৭৪ জন মুসলমানকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি 'গো ঔর ইসলাম' শীর্ষক বইটি এবং 'গৌ কি হিফাজত পর উলেমা কা নাজারিয়াৎ' নামের একটি সিডিও উদ্বোধন করা হয়।

'আমাদের পরের লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশ সেখানে আমরা পরবর্তী সম্মেলনটি একটি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে করতে পারি। আমরা সেখানে গোরু প্রতিপালনকারী মুসলমানদের শংসাপত্র, শাল ও একটি স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করবো', জানিয়েছেন আফজল। ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াস এই উদ্যোগের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, 'এটা খুবই ভালো উদ্দেশ্য, আমরাও হিন্দুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। গোরু হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র। তাই মুসলমানদেরও এই বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং গো-হত্যা বন্ধ করা উচিত।

‘একাত্ম মানবদর্শন’ নিয়ে চর্চা হওয়া দরকার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘একাত্ম মানবদর্শন’-এর রূপকার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ শুরু হলো। গত ২৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীর নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরির সভাগৃহে বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। জন্মশতবর্ষের সূচনা করে তিনি বলেন, আমাদের দেশের কিছু মানুষ শুধু কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে ধরেই থাকতে চায়। যদিও আমাদের মধ্যে বহু বাদবিবাদ হতে পারে এবং সেখানে মতভিন্নতাও থাকতে পারে। কিন্তু এতে কিছু যায় আসে না। এইসব তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে।

দিল্লীতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সভা।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ এবং তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রাজনাথ সিং বলেন, যদি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানইজম আলোচনা চলতে পারে তবে দীনদয়ালজীর ‘একাত্ম মানবদর্শন’ নিয়ে নয় কেন? আমরা যদি পাঠ্যক্রম থেকে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানইজম শিখতে পারি, তবে একাত্ম মানবদর্শনও শিখতে পারি। দীনদয়ালজী ভারতীয় জনসঙ্ঘের একজন প্রমুখ নেতা ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। সরকারের কাছে দীর্ঘমেয়াদি সাহায্যের মাধ্যমে গরিবদের উন্নয়ন করার একটা উপায় আছে। দ্বিতীয়টা হলো তাদের স্বাবলম্বী করা যাতে আর পরনির্ভর না হতে হয়। এখন আপনাদেরকেই কোনটা উপযুক্ত তা ঠিক করতে হবে। আমাদের সরকার কখনও ‘বকশিশ’ দিয়ে সমর্থন আদায় করতে চায় না। দীনদয়ালজীকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতে একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল অনেক বড় মাপের এবং সারা বিশ্বে ছিল কমিউনিজমের প্রভাব। এরকম এক পরিস্থিতিতে একটা সমান্তরাল তত্ত্ব বা দর্শন সৃষ্টি করা এবং সেইসঙ্গে চোখে পড়ার মতো একটা সংগঠন গড়ে তোলা, বাস্তবিকই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচয়। দীনদয়ালজী ছিলেন এইরকম এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। মোদী সরকারের বিভিন্ন কাজে দীনদয়ালজীর দর্শনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আগামী এক বছর ধরে কেন্দ্র সরকার দীনদয়ালজীর মানবদর্শনের ভাবনা তুলে ধরবে বলে তিনি জানান।

ভারতের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সন্ধানে আই সি এইচ আর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ (আই সি এইচ আর) খুব শীঘ্রই চালু করতে চলেছে তাদের দু'টি নয়া প্রকল্প। এর মধ্যে প্রথমটি হলো বৈদিক যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেশের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের নকশা প্রস্তুত করা। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক ন' মাস আগে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের কাজকর্ম শুরু করতে তার পুনর্গঠনে মন দেয়। পুনর্গঠিত কাউন্সিলের সদস্যরা গত ২৩ সেপ্টেম্বরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আরও একটি বিষয়ে তাদের প্রকল্প হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্তে সহমত হয়। এই প্রকল্পটি হলো প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। আই সি এইচ আর ইতিহাসবিদদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে যে সুপ্রাচীন সাহিত্য সম্ভারের তালিকা তৈরি করেছে তার মধ্যে রয়েছে বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, রসশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদি। ঐতিহাসিকরা মনে করছেন ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ণ, উদ্ভিদবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, মহাকাশ বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব এবং সেনা- কৌশলসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে অবহিত হতে এই পাঠ্যগুলি জরুরি।

আই সি এইচ আর-এর চেয়ারম্যান ওয়াই সুদর্শন রাও-এর বক্তব্য : ‘গোড়ার দিককার যেমন স্যার মনিয়ার উইলিয়মসের মতো ভারততত্ত্ববিদরা প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার আধুনিকতা দেখে রীতিমত মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার আগে পর্যন্তও বজায় ছিল। পালি সাহিত্য— বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই এবং পরে পারসী ও অন্যান্য দেশীয় সাহিত্যে আমাদের বিজ্ঞানের জয়যাত্রাও এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।' বিগত জমানায়, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষের সবকিছুকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুরু হয়। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয় কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের ভারতের ইতিহাস বিকৃতকরণের প্রচেষ্টা। মোটের ওপর ভারতের সুপ্রাচীন গৌরবমহিমান্বিত ইতিহাসকে খাটো করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। আর এহেন চেষ্টারই ফলস্বরূপ রামায়ণ-মহাভারতকে নিছক গালগল্প, বেদ-উপনিষদকে আবোল-তাবোল বলা ইত্যাদি কুশিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের ইতিহাসকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুরু হয়। তাই বেদ-পুরাণ আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আই সি এইচ আর-এর পরিকল্পনা হলো— এই প্রকল্প দু'টির কাজ আগামী তিন বছরের মধ্যে শেষ করা।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াজগতেও মমতায়ন শুরু হয়েছে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পারেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কাজটি করে দেখালেন। রাজ্যের ক্রিকেট প্রশাসনে বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর লাল পার্টি নাক গলাতে চেয়েছিল। তাই সিএবি-র প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়কে তাঁর আশীর্বাদধন্য প্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়েছেন। নির্দল প্রার্থী জগমোহন ডালমিয়ার কাছে বিস্তর ভোটের ব্যবধানে হেরে চিরকালের মতো বাংলার ক্রিকেট ময়দান থেকে তিনি বিদায় নেন। এখন বুদ্ধদেববাবুও প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ রাখেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্র, নির্বাচন, স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীন পরিচালন ব্যবস্থার অধিকার ইত্যাদি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'তিনি পশ্চিমবঙ্গের সব কিছুতেই নিজের কালীঘাটের ঘরবাড়ি মনে করেন। ওঁর কথা মেনে না চললে তিনি সে প্রতিষ্ঠান তুলে দেবেন। সেটা সিএবি হোক বা বিশ্ববিদ্যালয়।' শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন মমতা মানেন না। তাঁর সাফ কথা, সরকার যখন টাকা দেয় তখন সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সিএবি-কে রাজ্য সরকার টাকা দেয় না। উলটে ইডেনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ থাকলে পুলিশি ব্যবস্থার জন্য লাভ-সহ পুরো খরচ-খরচা রাজ্য সরকার আদায় করে। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন না যে সিএবি-কে আমরা টাকা দি। সুতরাং সিএবি-র প্রেসিডেন্ট কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেবেন।

জগমোহন ডালমিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে প্রেসিডেন্টের শূন্য পদে নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতভাবে নতুন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হবেন। এটাই সিএবি-র গঠনতন্ত্র। তার সংবিধান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না। তিনি নবান্ন থেকে ঘোষণা করে দিলেন যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এখন থেকে সিএবি-র নতুন প্রেসিডেন্ট, ওসব নির্বাচন- টির্বাচনের দরকার নেই। মমতা চান যে পঞ্চায়েত-পুরসভা থেকে

গূঢ় পুরুষের

কলম

বিধানসভার নির্বাচন সবই বন্ধ থাক। নির্বাচনের সময় বিরোধীরা শুধুই হল্লাবাজি করে। তাতে রাজ্যের উন্নয়ন মার খায়। একদা জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি জার্মানিতে সব ধরনের নির্বাচন তুলে দেন। পরিণামে জার্মানি ধ্বংস হয়।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিদি খেলাধুলোর ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নন। তাঁর পছন্দ রাজনীতির দাবা খেলা। বাম আমলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সিপিএমের চোখের মণি। কোনো নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে সৌরভকে সল্টলেকে বিশাল এলাকাজুড়ে জমি পাইয়ে দেন তৎকালীন সিপিএম মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য মশাই। তখন সৌরভের আবদার শোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দরজা দিন রাত খোলা থাকতো। বুদ্ধদেববাবু বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন সিএবি-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে সৌরভকে তাঁর প্রার্থী করতে। সৌরভ রাজি হননি। ডালমিয়া শুধুই তাঁর পিতৃবন্ধু ছিলেন না, তাঁর জন্যই সৌরভ ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলে ঢুকতে পেরেছিলেন। তাই এতবড় গদ্দারি করতে সাহস করেননি। একদা সিপিএমের চোখের মণি এখন মমতার স্নেহধন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনৈতিকভাবে সিএবি-র প্রেসিডেন্টের চেয়ার দখলের ঘটনায় সিপিএম নেতারা বিপদে পড়েছেন। তাঁরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া উপায় তো কিছু নেই। এতো নিজের থুতু নিজেরই গেলা। তবে সিএবি-র কর্তাদের নবান্নে ডেকে প্রেসিডেন্ট ঠিক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এক বিপজ্জনক রাস্তা দেখালেন। সারাদেশের অন্য কোনো রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির নেই। মুখ্যমন্ত্রীর আঁচল ধরে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রেসিডেন্টের কুরশি দখল করাটাও ইতিহাস হয়ে থাকবে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেশের অন্যতম সেরা সফল ক্রিকেট অধিনায়ক ছিলেন। ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য ভারতবাসী তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সেই ব্যক্তি মমতার আঁচল ধরে এই রাজ্যের উপাচার্যদের মতো পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। মমতার রাজনীতির খেলায় রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের প্রতিদিন অসম্মানের অন্ন খেতে হচ্ছে। এখন থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো নবান্নে গিয়ে সেলাম দিতে হবে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে মমতায়ন হয়েছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে শ্রীকান্ত মেহেতাদের হাত ধরে মমতায়ন হয়েছে। ক্রীড়া জগতেও মমতায়ন শুরু হয়েছে। চিটফান্ডের হাত ধরে রাজ্যের অপরাধ জগতেও মমতায়ন হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। তাই সৌরভের অধঃপতনে বিস্মিত হবেন না। এটাই বাংলা ও বাঙালির নিয়তি। ■

গোটা দেশকে আপনি কাঁদালেন মোদী

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
৭নং রেসকোর্স রোড, নয়াদিল্লী

এদেশে একটা কথা চালু আছে। বিদেশ থেকে কেউ সার্টিফিকেট পেলে তবে দেশ তাঁর মর্ম বোঝে। সেটা সিনেমা থেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতি সবেতে। এবার রাজনীতিতেও। ভারত যদিও আগেই আপনাকে বুঝে দেশের দায়িত্ব দিয়েছে। তবু বিরোধীরা এখনও নিন্দায় সরব। আপনার সবই নাকি ফাঁকা আওয়াজ। 'আচ্ছে দিন'- স্লোগানকে দিনরাত কটাক্ষ করা হচ্ছে। কিন্তু এবার তারা কী করবে! আমেরিকার হর্তাকর্তারা যে বলছে, স্বাধীনতার পর ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা আপনি।

কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার এই আমেরিকা সফর দেশপ্রেমী ভারতীয়দের চোখে জল এনে দিয়েছে। ভারত এমন গুরুত্ব কবে পেয়েছিল! রবীন্দ্রনাথ থেকে অমর্ত্য সেনরা নোবেল পেয়েছেন। সত্যজিৎ রায় অস্কার পেয়ে বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করেছেন নিজের নাম। কিন্তু এবার যে আপনি নিজের নাম নয়, ভারতের নাম উজ্জ্বল করে দিলেন।

এই মুহূর্তে বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় শব্দ 'গুগ্‌ল'। আর তার ডুডলটাই সেদিন হয়ে গেল ভারতের। জায়ান্ট স্ক্রিন জুড়ে থাকা বাঘটার গায়ে সাদা ডোরাগুলোয় ফুটে উঠছে ছ'টা ইংরেজি অক্ষর— গুগ্‌ল। বাঘটার উপরে-নীচে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়ায় লেখা দু'টো শব্দ— 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'!

গুগ্‌লের সদর দপ্তর গুগ্‌লপ্লেক্সে ওই জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল— প্রধানমন্ত্রী নন, কোনো সিইও যেন বক্তব্য রাখছেন মাইক্রোফোনে। সত্যি করেই তো আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সিইও-র ভূমিকাই পালন করলেন আপনি। আপনার স্বপ্নের আগামী ভারতের স্বপ্নের সঙ্গে পরতে পরতে জুড়ে গেল দুনিয়ার তথ্যপ্রযুক্তির 'প্রাণকেন্দ্র' সিলিকন ভ্যালি।

কখনও 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন। কখনও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র আহ্বান। ভবিষ্যৎ ভারতের যে ছবিটির কথা এত দিন বলে এসেছেন, এবার তা ব্যাপক সমর্থন পেল তথ্যপ্রযুক্তির মাথাদের কাছে। মাইক্রোসফট, অ্যাপল থেকে গুগ্‌ল---কে নেই! তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ার অন্তত সাড়ে তিনশোটি সংস্থার সিইও-রা নৈশভোজের টেবিলে আপনাকে জানিয়ে দিলেন, ভারত নিয়ে তাঁরা আগ্রহী। আপনার পরিবর্তন যজ্ঞে সামিল হতে চান তাঁরাও।

গুগ্‌ল-সিইও সুন্দর পিচাই বলেছেন, 'জেগে ওঠা দেশগুলির মধ্যে সব থেকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত।' মাইক্রোসফ্‌টের সিইও সত্য নাদেল্লা বলেছেন, 'মোদী ঠিক পথে এগোচ্ছেন। যে কাজ তিনি করতে চাইছেন, তা একেবারে ঠিক।' আর সিসকোর সিইও জন চেম্বারস আপনাকে তুলে ধরেছেন ডিজিটাল বিপ্লবের 'আশ্চর্য দূত' হিসেবে। তাঁর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য, 'ভারত তো বটেই, গোটা বিশ্বেই আপনি পরিবর্তন আনতে পারবেন!'

সেই আপনিই আবার বদলে গেলেন ফেসবুকের সদর দপ্তরে গিয়ে। মায়ের কথা বলতে গিয়ে নিজে কাঁদলেন, গোটা দেশকে কাঁদালেন। আসলে তো শুধু নিজের মায়ের কথা বলেননি, ভারতের মাতৃশক্তির কথা বলেছেন।

আপনি কান্নাভেজা গলায় বললেন, এক সময় বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে, কাপড় কেচে, জল তুলে কোনো মতে সংসার চালাতেন মা। এখন নব্বইয়ের কোঠায় বয়স। আজও নিজের সব কাজ নিজেই করেন। 'সুতরাং বুঝতেই পারছেন, নিজের সন্তানদের জন্য একজন মা কী কী করতে পারেন!'

আপনাকে নয়, আপনার ভারতমাতাকে সম্মান জানাতে ফেসবুকে হঠাৎ বদলে গেল মার্ক জুকেরবার্গের প্রোফাইল ছবি। গেরুয়া-সবুজ রং। আর মাঝখানে সাদা-কালো জুকেরবার্গের হাসি মুখ। তার উপরে লেখা, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সমর্থনে আমার প্রোফাইল ছবিটা পাল্টে দিলাম।' ভারতে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী, কোনো নেতা দেশের জন্য এই সম্মান আনতে পেরেছেন? কে এমন উথাল পাথাল ভালোবাসা জোগাড় করতে পেরেছেন? কে পেরেছেন ভারতমাতার কথা গোটা বিশ্বের দরবারে এমন গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিতে?

ফেসবুক সদর দপ্তরের সাদা দেওয়ালে জ্বল জ্বল করছে আপনার হাতের লেখা— 'অহিংসা পরম ধর্ম। সত্যমেব জয়তে। বন্দে মাতরম।' নীচে সই, নরেন্দ্র মোদী।

— **সুন্দর মৌলিক**

শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এযাবৎ দু' লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে আই এস

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ইসলাম পৃথিবীকে বিভক্ত করেছে মুসলমান ও অমুসলমান— এই দুই ভাগে। মুসলমানদের মধ্যেও আবার অনেক বিভাগ যার ভেতরে প্রধান শিয়া, সুন্নি ও আহমদি। শিয়াদের মধ্যে রয়েছে বারোজন ইমামের আলাদা অনুগামীরা। সুন্নিরা চারজন খলিফাকে মানে। সেই অনুসারে তারা চারভাগে বিভক্ত— হানাফি, শাফি, মালিকি ও হানবালি। ভারতবর্ষ, ইরাক, তুর্কি ও পশ্চিম দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রধানত হানাফি সুন্নিদের দেখা যায়। সুন্নিরা নিজেদের প্রকৃত সুন্নত বলে ভাবে ও অন্যদের অ-মুসলমান মনে করে। সুন্নত অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব যে সকল নিয়ম নিজে মানতেন সেগুলি যথাযথভাবে পালন করা। তাদের কাছে শিয়া ও আহমদিরা মুসলমান নয় এবং তারা বৈধভাবে হত্যার যোগ্য বা ওয়াজির উল কত্‌ল।

শিয়া মুসলমানদের প্রাধান্য ইরান, ইরাক, আজারবাইজান ও লেবাননে। তারা মনে করে প্রকৃত মুসলমান শিয়ারাই। আহমদিয়াদের শিয়ারাও মুসলমান বলে ভাবে না। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে মুয়াইবার হাতে হজরত আলির মৃত্যুর পর শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল তার অবসান আজও হয়নি এবং এরই প্রকাশ আজও দেখতে পাওয়া যায় সংবাদ মাধ্যমে, পাকিস্তানে শিয়া মসজিদ ও শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে গণহত্যার খবরগুলিতে।

আহমদিয়াদের উৎস পাঞ্জাবের কাদিয়ানে। তাদের কোনো মুসলমানই প্রকৃত মুসলমান বলে ভাবে না এবং আহমদিয়াদের হত্যাকে তারা ধর্মীয় হত্যার মধ্যে গণ্য করে। ফলে আহমদিয়াদের গণহত্যা করা হয়েছে পাকিস্তানে বহুবার এবং এখনও তার বিরাম হয়নি।

উল্লেখিত এই দলগুলি ছাড়াও ইসলামের সঙ্গে রাজনীতি ও ক্ষমতা দখলের একটা ব্যাপার জড়িয়ে যাওয়ায় অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা দলের উদ্ভব হয়ে চলেছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মক্কায় ধর্মসংস্কারক আব্দুল ওয়াহাব প্রবর্তিত ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা হয়। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় বিধর্মী (পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ ও পরে বৃটিশদের) মালিকদের উচ্ছেদ সাধন করে ব্যক্তিগত মালিকানা শেষ করা। তিতুমির, শরিয়তউল্লা ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। অন্যধর্মমত বিষয়ে ফরাজিরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল এবং হিংসা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেদের মত প্রচার করত। ইদানীং বিংশ শতাব্দীর নানা সময়ে ইসলামের সঙ্গে রাজনীতিযুক্ত হয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নানা দেশে নানা আন্দোলনের জন্ম হয়েছে ও এখনও হয়ে চলেছে। এর ফলে বহু চরমপন্থী মৌলবাদী দলের উদ্ভব হয়েছে, যেমন মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড (আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের তালিবান ও আল কায়েদা), ভারতে জামাত-ই- ইসলামি, আহলে হাদিস দেওবন্দি, তবলিগি জমাত, বরেলভি আন্দোলন ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর সাম্প্রতিকতম সংযোজন ইসলামিক স্টেটের প্রবক্তা এক ভয়ঙ্কর হিংস্র ও ধ্বংসকামী দল যার ধ্বংসাত্মক কাজের বিবরণ গত কয়েকবছর ধরে প্রতিদিন খবরের কাগজ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জ্বালানি তেল বা পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত দ্রুতগামী যান চালনার জন্য পেট্রোলিয়ামের কোনো বিকল্প জ্বালানি না থাকায় এই সম্পদ পৃথিবীতে নানাভাবে অশান্তির মূল হিসাবে দেখা দিয়েছে। আমরা বহু দশক ধরেই দেখছি মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলিতে কায়েমি স্বার্থযুক্ত বাইরের দেশ নামে অথবা বেনামে এই সব তৈলক্ষেত্রের মালিকানা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এই সব অঞ্চল কখনই শান্তি ও স্বস্তির মুখ দেখছে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে উপস্থিতি ও এক এক সময়ে এক এক দলকে তুলে ধরা বা অপসৃত করাও এই খেলারই একটা অঙ্গ।

আমেরিকা ইরাক ও কুয়েতের লড়াইয়ের পর ইরাক থেকে সৈন্য অপসারণ করে নিলে ও সাদ্দাম হুসেনের মৃত্যুর পর শিয়া রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ক্ষমতা চলে গেলে ইরাকে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। শিয়া প্রধানমন্ত্রী নুরি মালিকির শাসনে বিরক্ত সুন্নিরা, যারা ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়েছে তারা এবং আল কায়েদা ছেড়ে আসা জঙ্গিরা মিলে ইসলামিক স্টেট বা আই এস নামে এক দল গঠন করে যার শীর্ষে রয়েছে আবু বকর আল বাগদাদি। এই দল ইরাকের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দখল করে নেয় যার মধ্যে রয়েছে মসুল, তিকরিত, রামাদি, ফালুজার মতো শহর ও বিস্তীর্ণ তৈলক্ষেত্র। এরা ইরাক লাগোয়া সিরিয়ার পূর্ব অংশেও বিশেষ করে রাক্কা এবং দিয়ের এজোর অঞ্চলে নিজেদের দখল কায়েম করে। লাউড স্পিকার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে এরা সরকার-বিরোধী মানুষদের আহ্বান জানায় তাদের দলে যোগ দেবার জন্য। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিরাট সংখ্যক মানুষ আই এস এ যোগ দেয় যার ভেতরে সৈন্য, পুলিশ অফিসার ও সরকারি কর্মচারীরাও রয়েছে। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি পেলে তারা প্রচার করে যারা সমর্থন করবে না তাদের হত্যা করা হবে। ২০১৫ সালের মে মাসের হিসাব অনুযায়ী এই দলের দখলে আসে প্রায় ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গা যা অনেকের মতে আরও অনেক বেশি, ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটারের কম নয়। এছাড়াও এদের সম্পদের পরিমাণ বলা হয় দুই বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই সম্পদের উৎস তৈলক্ষেত্র এবং গ্যাস উৎপাদক অঞ্চল, মানুষের ওপর চাপানো কর, তোলাবাজি, স্মাগলিং করে পাওয়া অর্থ, মুক্তিপণ ইত্যাদি। এভাবে প্রতি মাসে তাদের আয়ের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ ডলার। এদের অধিকৃত অঞ্চলে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের বাস। তারা সেইসব অধিবাসীদের মধ্যে অমুসলমানদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কর আদায় করছে, অন্যথায় তাদের ইসলাম কবুল অথবা দেশত্যাগে বাধ্য করছে। এর ফলে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। বিশেষ করে খৃষ্টান ও ইয়েজদিরা। তারা মেয়েদের গৃহবন্দী থাকতে ও পর্দা মানতে বাধ্য করে। প্রসঙ্গত বলা যায় সিরিয়ায় পর্দাপ্রথা সরকারি ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল ২০১১ সালে।

আই এস চায় পশ্চিম ইরাক ও পূর্ব সিরিয়ার

বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে এক খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে যেখানে শরিয়তি শাসন বলবৎ হবে। উদ্দেশ্য সাধন করতে তারা দমন ও উৎপীড়নের পথ নিয়েছে। বলা হচ্ছে সিরিয়ায় ২০১১ সাল থেকে এযাবৎ তারা প্রায় দুই লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। ইরাকেও নিহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ইরাকের প্রাচীন আসিরিয় (অসুর) সভ্যতার নিদর্শনগুলি তারা ধ্বংস করে ফেলেছে, ঠিক যেমন তালিবানেরা কয়েক বছর আগে ধ্বংস করেছিল বামিয়ানের বুদ্ধ ও অন্যান্য বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি। ইয়েজদি, খৃষ্টান ও শিয়া মেয়েরা নরকযন্ত্রণায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে। পরাজিত এই সব পরিবারের মেয়েদের তিরিশ ডলার দামেও দাসী হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বিক্রি করার আগে তাদের ওপর দৈহিক জান্তব অত্যাচার চালানো হচ্ছে। ছোট ছোট বালিকারাও এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। ফলে হাজার হাজার মানুষ সপরিবারে জান-মান নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। তাদের পালাবার প্রধান গন্তব্য হলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। পালাবার পথ প্রধানত তুরস্ক হয়ে ভূমধ্যসাগরের দুই কিলোমিটার পথ নৌকায় পাড়ি দিয়ে গ্রীস অধিকৃত এক দ্বীপে ওঠা ও সেখান থেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে যাওয়া। এ ছাড়াও আফ্রিকার উত্তরাংশ থেকে নৌকায় ভূমধ্যসাগর পার করে স্পেন, ইটালি, সিসিলিয়ামালটা হয়ে ইউরোপে ঢোকা। নৌকায় এই পথ পাড়ির বিপদ থেকে অনেকেই রক্ষা পাচ্ছে না। ফলে শয়ে শয়ে মানুষ মারা পড়ছে। এরকমই এক মৃত শিশুর সাগরতীরে পড়ে থাকা ছবি সারা পৃথিবীর মানুষকে অস্থির করে তুলেছিল কয়েকদিন আগে।

আই এস ইসলামের শত্রু হিসাবে অনেকগুলি দেশকে চিহ্নিত করে সেখানে প্রকৃত ইসলামি শাসন প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে কঠোর ঘোষণা করেছে। শত্রু রাষ্ট্রের তালিকায় পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে আছে এশিয়ার বহু দেশ ও ভারত। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী জুড়ে তরুণ-তরুণীরা ঘর ছাড়ছে সন্ত্রাসবাদের পথে। এর মধ্যেই খবর হলো আলকায়েদার প্রধান আয়মান আল জওয়াহিরি সরাসরি আই এস প্রধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে, আই এস কখনই বিশ্বের সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে না। নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে তিনি অবৈধ কাজ করেছেন।

এছাড়াও ভারতে প্রধান প্রধান মসজিদ দরগার ইমাম ও মুফতিদের নিয়ে ১০৫০ জন মিলে নিজেদের সঙ্গে ইউনাইটেড নেশনস্-এর মহাসচিব বান কি মুনকেও যুক্ত করে এক ফতোয়া জারি করেছে যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে আই এস এ-র এভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা, হত্যা প্রক্রিয়া-সহ নিহত মানুষদের ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা সম্পূর্ণ ভাবে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। এই ফতোয়ার সঙ্গে যুক্ত দার-উল-উলুম আলি হাসান আহলে সুন্নতের প্রধান উপদেষ্টা ড. আবদুল রহিম আঞ্জারিয়া বলেন— এই ফতোয়া ভারতের অনুগ্র ইসলামি মতের পরিচায়ক এবং আই এস এ-র শরিয়তবিরোধী উগ্রপন্থার বিরোধী। তিনি ইউ এস, ইউ কে, চীন, ফ্রান্স, আরব দেশগুলি-সহ বিশ্বের ৪৭টি দেশের প্রধানদের মত নিয়ে নিজেদের আবেদনটি প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি বলেছেন, কোরান অনুসারে একজন নিরাপরাধকে হত্যা করা সমগ্র মানবসমাজকে হত্যা করার সমান।

দুরাচারী হিংস্র আই এস-কে পর্যুদস্ত করতে পারবে একমাত্র বিশ্বধাত্রী ও মানবমুক্তির পথের দিশারি এই ভারতই। মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে এই ভারতই একদিন ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করেছিল; সমগ্র মানবজাতির নিপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্তদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই ভারতেরই এক রাজা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার হেলায় ত্যাগ করেছিল। আজ সেই ভারতই এগিয়ে এসেছে ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য, অহসন এ তকবিম-কে রক্ষা করার জন্য।

(লেখিকা যোগমায়া দেবী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

“আই এস জঙ্গিদের অধিকৃত অঞ্চলে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের বাস। এদের মধ্যে অমুসলমানদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কর আদায় করা হচ্ছে, অন্যথায় তাদের ইসলাম কবুল অথবা দেশত্যাগে বাধ্য করছে। এর ফলে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। বিশেষ করে খৃষ্টান ও ইয়েজদিরা।”

নাসিক অমৃতকুম্ভে

নবকুমার ভট্টাচার্য

নতুন কোনো কথা নয়। বলা কথা আবার নতুন করে বলা। একথা পুরাণের কথা। দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হলেন ভগবান বিষ্ণু। দেবতাদের নিয়ে সমুদ্র মন্থন করতে বললেন পিতামহ ব্রহ্মাকে। এই বিশাল কর্ম শুধু দেবতাদের পক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব নয় বলে সঙ্গে অসুরদেরও নিতে বললেন। মন্থন শেষ হলে দেবী লক্ষ্মী আর ধন্বন্তরী উঠে আসবেন সমুদ্র থেকে। তিনিই আসবেন অমৃতের কুম্ভ নিয়ে। দেবতাদের বৈদ্য ধন্বন্তরী। কথা হলো মন্থনে যা কিছু সম্পদ উঠবে তা সমানভাবে ভাগ করে নেবেন দেবতা ও অসুরেরা।

সমুদ্র মন্থন শুরু হলে দেববৈদ্য ধন্বন্তরী অমৃতভরা কুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন। দেবতাদের পরমধন অমৃত কুম্ভের কথা জানতেন ইন্দ্র। ওই কুম্ভ যাতে দেবতাদের হাতছাড়া না হয়, অসুরদের হাতে না পড়ে, তার জন্য দেব বৈদ্যের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পালাতে বললেন পুত্র জয়ন্তকে। পিতা ইন্দ্রের আদেশে দেববৈদ্যের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে অমৃত ভরা কুম্ভ নিয়ে ছুটতে লাগলেন জয়ন্ত। সমুদ্র মন্থনের একমাত্র সার বস্তুই যে অমৃত। যা পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অসুরদের আদেশ দিলেন জয়ন্তকে ধরতে। আগে জয়ন্ত ছুটছেন অমৃতকুম্ভ নিয়ে। পিছনে ছুটছেন অসুররা। এইভাবে সমানে তিনদিন ছোটার পর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ভেবে জয়ন্ত বিশ্রাম নিতে বসলেন অমৃত কুম্ভটি মাটিতে রেখে। দেখলেন অসুররা এসে পড়েছে। আবার ছুটতে আরম্ভ করলেন ইন্দ্রপুত্র। টানা তিনদিন ছুটে বসলেন বিশ্রাম নিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলেন অসুররা। আবার কুম্ভ নিয়ে ছুটতে লাগলেন জয়ন্ত। এইভাবে জয়ন্ত তিনদিন পরে পরে অমৃত পূর্ণকুম্ভ নামিয়ে রেখেছিলেন চার জায়গায় এবং বারোদিন পরে ফিরে এলেন সমুদ্র মন্থন ক্ষেত্রে। কুম্ভ নিয়ে পালানোর সময় জয়ন্ত হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনিতে অমৃতকুম্ভ নামিয়ে রেখে বিশ্রাম করেছিলেন। কুম্ভ নামানোর সময় কয়েক ফোঁটা পড়েছিল এইসব স্থানে। একটানা তিনদিন ছোটার পর জয়ন্ত এক একটি জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন বারোদিন পরে। মানুষের এক বছর দেবতাদের কাছে একদিন মাত্র। সেইজন্য প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর চার জায়গায় কুম্ভমেলা হয়। গড়ে পূর্ণকুম্ভ হয় বারো বছর পরে। কুম্ভ স্নানে ফল লাভের কথাপ্রসঙ্গে পুরাণে রয়েছে, কার্তিকে সহস্রবার, মাঘ মাসে শতবার গঙ্গাস্নানে এবং বৈশাখে কোটি নর্মদা স্নানে যে ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত বাজপেয় যজ্ঞে যে ফললাভ হয়, লক্ষবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলে যে ফল লাভ হয় একবার কুম্ভ স্নানেই তা পাওয়া যায় :

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।
লক্ষম্ প্রদক্ষিণাঃ পৃথব্যাঃ কুম্ভস্নানেন তৎফলম্।।

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংগ্রামের সময়ে অমৃতভরা কুম্ভটি

রক্ষায় বিশেষ যত্নবান ও তৎপর ছিলেন সূর্যদেব, চন্দ্রদেব এবং দেবগুরু বৃহস্পতি। তাই বিশেষ রাশিতে এ তিনের সংযোগে বিশেষ তিথিতে অবস্থান সময়ে কুম্ভযোগ হয়। বর্তমান বর্ষে নাসিকে গোদাবরী তটে কুম্ভস্নান যোগ সংঘঠিত হয়েছিল— 'সিংহরাশিং গতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ। গোদাবর্য্যাং ভবেৎ কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদা।' ৩১ শ্রাবণ কুম্ভের প্রথম স্নানযোগ আরম্ভ হয়েছিল আর ৩১ ভাদ্র শেষ হলো শেষ শাহীস্নান।

কুম্ভমেলা সাধু সন্ন্যাসীদের মিলন মেলা। সুপ্রাচীনকালে আর্যঋষিরা অতি নির্জন স্থানে। ধ্যানযোগ পরায়ণ হয়ে মনুষ্য জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে চিন্তা করে মহামঙ্গলময় সিদ্ধান্তে সকলে উপনীত হতেন। এই স্থানে তাঁরা পরস্পর ভাববিনিময় করতেন। পরে পরে কর্মক্লিষ্ট জীবগণ সংসারে নানা প্রকার বিপদ ও অশান্তির মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে তাঁদের শীতল পদছায়ায় গিয়ে জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করতেন। আজ কুম্ভমেলা বিশ্বের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক মেলার গৌরব অর্জন করেছে। সাধুদের মুখ্য চারটি সম্প্রদায় ও বহু উপসম্প্রদায় এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। নাসিকে কুম্ভস্নান প্রসঙ্গে গোদাবরীতে সাধুদের মধ্যে সবার প্রথমে স্নান করে জুনা আখড়া। তারপর নিরঞ্জনী এবং সবশেষে স্নান করে মহানির্বাণী। তারপর বিভিন্ন আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বররা স্নান করেন নিজ নিজ আখড়ার সঙ্গে।

গোদাবরীর তীরে রামায়ণ প্রসিদ্ধ রামলীলাক্ষেত্র নাসিক নগরী। গোদাবরী নদী ব্রহ্মগিরি পর্বত হতে প্রবাহিত। ব্রহ্মগিরির গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানকে গঙ্গাদ্বার বলা হয়। কুশাবর্ত হতে ব্রহ্মগিরি পর্বত চার মাইল উচ্চে। ১৫২ টি সিঁড়ি ভেঙে হয়ে যেতে হয় গোদাবরীমাতার মন্দিরে। নীচে কুশাবর্ত কুণ্ড। দশরথের মৃত্যুর পর যে কুণ্ডে স্নান করে রামচন্দ্র কুণ্ডের তীরে পিণ্ডদান করেছিলেন। সন্ন্যাসীরা নাসিকের রামকুণ্ডের সঙ্গে এই কুণ্ডে স্নান করে বাবা ত্র্যম্বকেশ্বরকে দর্শন করে থাকেন। নাসিক শহরটি গোদাবরীর দক্ষিণতটে এবং পঞ্চবটী বামতটে অবস্থিত। এই পঞ্চবটীতেই হয়েছিল রাবণের হাতে জটায়ুর নিধন এবং সীতাহরণ। তারও পূর্বে লক্ষ্মণের হাতে সূর্পনখার নাক কাটা গিয়েছিল এই স্থানে। এখানেই রয়েছে কপিলাসঙ্গম। রয়েছে সীতাকুণ্ড।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে গোদাবরীর তীরে তপোবনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে আমি যখন পৌঁছালাম তখন কুম্ভমেলা জমজমাট। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রয়ে হাজার কয়েক স্নানার্থী। আশ্রমের সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁদের সেবা করে চলেছেন। এখানে যেন চলছে অন্য এক কুম্ভ। শুনলাম দিন দুয়েক পূর্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই নতুন ভাবে তাঁবুগুলি সাজাতে হয়েছে। তাঁবুর মাথায় দিতে হয়ে কর্গেটের টিন এবং শয়নের জন্য খাট।

১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১২টার পর যখন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার স্নানার্থীর রামকুণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ হলো তখন এক অন্যমাত্রা পেয়ে যায় এবারের কুম্ভমেলা। কুম্ভমেলায় ভোরবেলা উঠে ভিড় ঠেলে দীর্ঘ পথ হেঁটে সাধুদের শিবিরে শিবিরে হানা দিয়ে নানা কাহিনি শোনা, তারপর নদীতটে গিয়ে পুণ্যার্থী মানুষদের সঙ্গে মিশে যাওয়া। কুম্ভ মানে হাঁটা আর হাঁটা। মেলা প্রাঙ্গণের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানো, তারপর গভীর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়া— এটাই কুম্ভের রুটিন। কিন্তু এবারের কুম্ভমেলার রুটিন বৃষ্টিতে বিঘ্ন

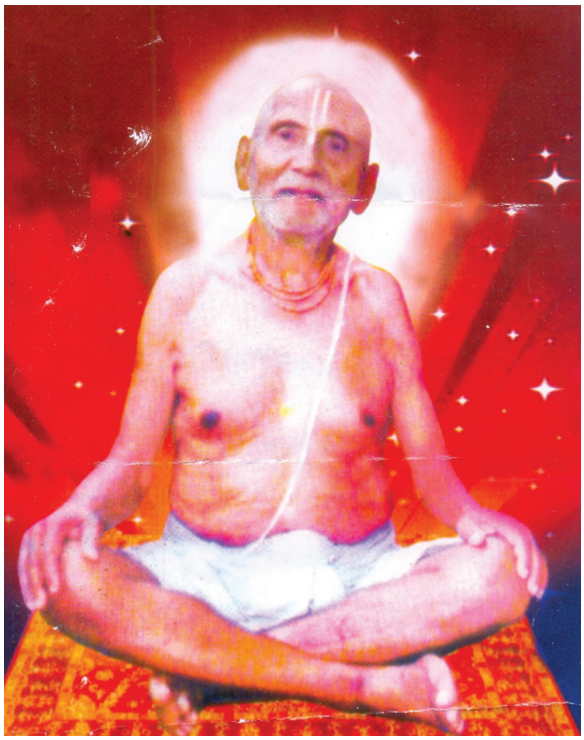

শিবানন্দ বাবা

শ্রীরামচন্দ্রকে ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা মহর্ষি কশ্যপের

রাম রাম মহাবাহো মদবাস্যম্ কুরু যত্নতঃ।
সিংহস্থে সুরগুড়ি দুর্লেভম্ গৌতমী জলম্।।
যত্র কুভাপি রাজেন্দ্র কুশাবর্ত বিশেষতঃ।
তব ভাগ্যেন নিকট বর্তনে ব্রহ্মভুধরে।।
সিংহস্যেদপি সমায়াতস্ত গত্বা সুখী ভব।
যাবেদ্ভ্যোন্তি সিংহস্থস্তাবনিষ্ট মমাশয়।।
সিংহস্থেষু সমাবতে রাম কশ্যপ সম্ভুতঃ।
ত্র্যম্বকক্ষেত্রে মাগস্য তীর্থযাত্রা চকার।।

হয়েছে। কুম্ভ মেলায় নদীর জলে ডুব দিয়ে তিন জন্মের পাপ ধুয়ে ফেলা যায় কিনা জানি না, অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকার অর্জিত হয় কিনা তাও জানা নেই। শুধু জানা আছে বর্ণে, বৈচিত্র্যে, অলৌকিকতায় একবার কুম্ভে না এলে প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখা হয় না।

সাধুসঙ্গম ছাড়া কুম্ভ লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো। সাধুদের বিচিত্র এবং বিশাল সম্মিলনই কুম্ভমেলার প্রাণ। এই কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন শিবানন্দ বাবা। যাঁর জন্ম তারিখ ৮.৮.১৮৯৬ অর্থাৎ ১২০ বছরের এক তেজস্বী পুরুষের সাক্ষাৎ হলো। কাশীর এই মানুষটি ১০টি গুণের অধিকারী। তিনি রোগমুক্ত, কামনা মুক্ত, বাসনামুক্ত, দুঃখ রহিত, চিন্তামুক্ত, সমস্যামুক্ত। তিনি ফল খান না, দুধ পান করেন না, দান এবং অর্থ গ্রহণ করেন না। তবে তপোবন থেকে ত্র্যম্বকেশ্বরে সাধু সন্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ■

অমৃতযাত্রা

গোপন গোদাবরী আর বিস্তৃত তপোবনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে রয়েছে মহামানবের মিলনমেলা। আমরা সকলেই জানি ভারতাত্মা বয়ে চলেছে গঙ্গার স্রোতধারায়। পুরাণের এই মহানদী যখনই অন্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখনই পুণ্য ও পূর্ণ হয়ে উঠেছে সঙ্গম। দক্ষিণ পশ্চিমের এই গোদাবরী পূর্ব উত্তরের গঙ্গার স্পর্শেই পুণ্যতোয়া। গোদাবরীর ধারাস্পর্শে মেলে গঙ্গার পুণ্যছোঁয়া। গৌতমমুনির তপস্যায় স্বয়ং শিব গোদাবরীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন পতিতপাবনী গঙ্গাকে। সেই সঙ্গমেই গরুড় নামিয়ে রেখেছিলেন মহাকুম্ভ। কিন্তু গোদাবরীর দর্শন মিলবে না নাসিক বা ত্র্যম্বকেশ্বরে। প্রচলিত বিশ্বাস তিনি এখানে পাতাল গুপ্ত। আসলে নদীপথ বদলে গিয়েছে সময়ের ফেরে। শহরের মাঝে কুশাবর্ত। সংক্ষিপ্ত জলাধার। তার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে গোদাবরীর পাতালধারা। অথচ এই পুণ্যতোয়ার তীরেই স্নানের প্রথম অধিকার নিয়ে ১৭০৩ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে শৈব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের। মারা গিয়েছিলেন শতাধিক সাধু। শৈব ও বৈষ্ণবদের বিবাদভঞ্জন করে ১৭৭৮ সালে ফের যখন শুরু হলো কুম্ভমেলা, তখন পোশোয়া মাধবরাও শ্রীমন্ত বৈষ্ণবদের ঠেলে দেন নাসিকে। সে সময় থেকেই বৈষ্ণবদের স্নানযাত্রা শুরু হয় তপোবন সংলগ্ন গোদাবরীতে আর শৈবদের রমরমা ত্র্যম্বকেশ্বরে। নাসিকে এলেই মনে পড়ে যাবে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'-এর বৃত্তান্ত। পুরাকালে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বনবাসের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন এই নাসিকের তপোবনে। এখানেই সূর্পনখা লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করে নাসিকা হারিয়েছিল। সূর্পনখার নাসিকা বৃত্তান্তের সূত্রেই শহরের নামকরণ।

রাণিচন্দ্র, কালকূট, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে নবনীতা দেবসেন পর্যন্ত মহাকুম্ভের কম বিবরণ লেখেননি। তাঁরা গিয়েছেন হরিদ্বার বা প্রয়াগের মহাকুম্ভে। আমি এসেছি নাসিক আর ত্র্যম্বকেশ্বরের কুম্ভে। হরিদ্বার বা প্রয়াগের তুলনায় এই দুই শহরের কুম্ভমহিমা কিছু হ্রস্ব হলেও আমার কাছে তাই শ্রেষ্ঠতম। কারণ গঙ্গার তুলনায় গোদাবরী ঈষৎ গৌরবহীনা কিনা, সে হিসেব আমার কাছে মূল্যহীন। আমার কাছে কুশাবর্ত আর নীলগিরি, রামঘাট আর ব্রহ্মগিরি হয়ে উঠেছিল দেদীপ্যমান। নাসিকের রামায়ণ ক্ষেত্র আমাকে অধিকার করে নিয়েছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। কুম্ভে বৃষ্টির কথা না বললে বিবরণ অসম্পূর্ণ মনে হবে। এই বৃষ্টির মধ্যেই অন্য এক অমৃতযাত্রার পথে চলেছে মানুষ। কারো কারো অঞ্জলি ভরে উঠছে বারিধারায়। আজ ভাদ্র সংক্রান্তি পুণ্যযোগে মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নান। অবশ্য পরে অন্য একটি স্নানের যোগ রয়েছে ত্র্যম্বকেশ্বরে। সাধুরা শোভাযাত্রা সহকারে যাচ্ছেন কুম্ভস্নানে।

প্রতিটি আখড়ার শোভাযাত্রার সামনে গোষ্ঠীর প্রধান সন্ন্যাসী রথে বা গাড়িতে। কেউবা অশ্বে বা হস্তীপৃষ্ঠে আসীন হয়েছেন। শূন্যে স্থাপন করে রেখেছেন ডান হাতের বরাভয় মুদ্রা। অন্যহাতে ত্রিশূল বা কৃপাণ বা তরবারিতে ঝলসাচ্ছে যশ ও অহঙ্কারের উদ্ভাস। তাঁদের অনুগামীরা 'গুরুমহারাজ কী জয়', 'শঙ্কর ভগবান কী জয়', 'গোদাবরী

মাই কী জয়', 'শিবশম্ভু কী জয়' ইত্যাদি নানা ধ্বনিতে উল্লসিত। অনুগামী ভক্তদের কাড়া-নাকাড়া আর শঙ্খনাদে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ- বাতাস। গাড়ি বা রথ থেকে সমাগত ভক্তদর্শকদের দিকে ক্রমাগত উড়ে আসছে লজেন্স, চকলেট, খেজুর, তিলকুটের প্রসাদাদি। সাধুদের নিক্ষিপ্ত প্রসাদ পেতে হাজারো দর্শকের হুড়োহুড়ি।

এই সাধুদের যাত্রাপথেই দর্শন হলো ত্রিগুণেশ্বরানন্দের সঙ্গে। সৌম্যকান্তি শ্বেতশুভ্র বছর চল্লিশের এই যুবক সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে ছিলেন দর্শনের প্রখ্যাত অধ্যাপক। দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বই একদিন তাঁকে টেনেছে ঈশ্বরের দিকে। দার্শনিকতত্ত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে শূন্যে। স্ত্রী পুত্রকে গৃহে রেখে তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ের গঙ্গোত্রীতে। পরে প্রয়াগের কুম্ভে পরমানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর কৃপায় শৈবসাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। বিলাসের জীবন পিছনে রেখে স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে এই জীবন আসলে কেমন? এই প্রশ্ন করার পরেই স্মিতহাস্যে উত্তর মিলল— কিছুই না, জীবন শূন্যময়। শূন্যতার অনুধ্যান করছি আমি। কেবল নিজেকে জানতে চেয়েছি আমি। উপনিষদ তো এ কথাই বলছে 'আত্মানং বিদ্ধি।' 'সেল্‌ফ ইজ দ্য সোল, সোল ইজ দ্য সেল্‌ফ। নাথিং লাইক দ্যাট।' কুম্ভে পুণ্যার্থীরা স্নান ও সাধু দর্শনে যান বটে কিন্তু সাধুদের ভয়ে বড় একটা দেখেন না। নাগা সাধুরা একটু মারমুখো, অন্য সব সাধুরাও বিশেষ নরমপন্থী নন, কাজেই সাধু আখড়ায় পুণ্যার্থীর ভিড় কমই থাকে। কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সেই আখড়ায় প্রবেশ করলেই কিন্তু সাদর আহ্বান জানান সকলে। তবে মন্দির মসজিদের গাজর ঝুলিয়ে রেখে ক্ষমতাভোগের রাজনীতিতে সাধুরা বিরক্ত। নাসিক কুম্ভমেলায় শৈব আর বৈষ্ণবদের যত লড়াই থাক সনাতন হিন্দুধর্মের গৌরবের জন্য 'রামমন্দির জরুর হোনা চাহিয়ে' — মত সকলের।

কুম্ভ মানে ধনী, নির্ধন, দুরাত্মা, পুণ্যাত্মা, সতী, অসতী, গৃহী সন্ন্যাসী--- সব মিলেমিশে একাকার। পূর্ণকুম্ভ মানেই অগণিত চরিত্র, অসংখ্য ঘটনার ঘনঘটা। কুম্ভে সাধুসঙ্গ করার পিছনে আমার উদ্দেশ্যে ছিল আধ্যাত্ম জীবনে তাদের প্রাপ্তির কথা জানা। একাদশ কুম্ভ করার পরেও সেই জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি। ২১ সেপ্টেম্বর রাতে নাসিক থেকে যখন ফিরছি তখন তপোবন পঞ্চবটীতে মেলা শেষ হয়েছে। সর্বত্র ভাঙাভাঙি চলছে। সাধুরাও ফিরে গেছেন যে যাঁর স্থানে।

আগামী কুম্ভমেলা উজ্জয়িনীতে আবার দেখা হবে।

ন. কু. ভ.

আমার দেখা নাসিক কুম্ভ

তপন মুখোপাধ্যায়

নাসিক অর্থাৎ ত্র্যম্বকেশ্বরের গোদাবরী তটে দ্বিতীয় শাহি স্নানের উদ্দেশ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে আমরা ছয় বন্ধু রওনা দিয়ে পরদিন বিকেলে নাসিক পৌঁছলাম। 'লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পনখার নাসিকা ছেদন' থেকে এই নাসিক নামকরণের সার্থকতা। শ্রীমৎ কাঠিয়া বাবার শিবিরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত নাসিকের বিভিন্ন স্থান যেমন— রামঘাট, পঞ্চবটী, কালারাম মন্দির, সীতাগুহা, সূর্পনখার মন্দিরগুলি দু'দিন ধরে দেখলাম। প্রসঙ্গত এই রামঘাটেই কুম্ভস্নানের প্রধান ঘাট হিসাবে বিবেচিত হয়। এর পূর্বে দুই কুম্ভ অর্থাৎ হরিদ্বার ও প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্নান করার অভিজ্ঞতা নিয়ে নাসিকে আসা।

অবশেষে বহু প্রতিক্ষিত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে সিংহরাশিতে বৃহস্পতি ও সূর্যের অবস্থানকালে আয়োজিত দ্বিতীয় শাহি স্নানের জন্য ভোর চারটের সময় রামঘাটের উদ্দেশে রওনা দিলাম। প্রশাসনের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় কুম্ভস্নান সমাপন হলো। পূর্বের দু'টি কুম্ভের সঙ্গে এবারের কুম্ভের সাদৃশ্য চোখে পড়ল। কুম্ভস্নান করি বটে কিন্তু কুম্ভ হৃদয় দিয়ে অনুভবের বিষয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস আলাদা হলেও উদ্দেশ্য এক— কুম্ভস্নান করে পুণ্যলাভ। প্রত্যেককেই এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণে বেঁধে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিষয় আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম। বিভিন্ন সন্ত-মহারাজদের আশীর্বাদধন্য আমার জীবনে তিনটি কুম্ভ স্নান সমাপ্ত করে চতুর্থ স্নানের বাসনা নিয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ট্রেনে উঠলাম। কুম্ভমেলার জয় হোক। সার্থক হোক মানুষের এই মিলন মেলা। ■

দেবী চণ্ডীর মানসপুত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সুতপা বসাক ভড়

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নামটির সঙ্গে আমরা সবাই একাত্মভাবে পরিচিত। দুর্গাপূজার প্রারম্ভ তাঁকে ছাড়া ভাবাই যায় না। মহালয়ার দিন ভোর চারটের সময় আকাশবাণী থেকে প্রসারিত 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'-তে তাঁর উদ্দাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনার জন্য আমরা সারা বছর উদগ্রীব হয়ে থাকি। তাঁর আহ্বান 'জাগো, জাগো, মা জাগো' শুনে মা দুর্গাও স্থির হয়ে থাকতে না পেরে রওনা দেন মর্ত্যলোকের উদ্দেশে। মা দুর্গার এই অসীম কৃপার জন্য আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সংস্কৃতের প্রথম শিক্ষা তাঁর ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর কাছে। যোগমায়া দেবী ছিলেন সংস্কৃত এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই সাবলীলভাবে পারদর্শিনী। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর পাঁচটি শিশুসন্তান নিয়ে তিনি নাভার মহারানীর গৃহশিক্ষিকার কার্যভার সামলান। ওই যুগে তাঁর এই সাহসিক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

১৯০৫ সালের ৪ আগস্ট উত্তর কলকাতার আহিরীটলাতে জন্মগ্রহণ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বাবা রামবাহাদুর কালীকৃষ্ণ ভদ্র এবং মা সরলাবালা দেবী। কালীকৃষ্ণ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যাকাশে স্বনামধন্য ছিলেন; ১৪টি ভাষায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারপর ১৯২৬ সালে আই. এ. এবং ১৯২৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। ওই বছরেই হাওড়ার বিখ্যাত বসুপরিবারের ফণীন্দ্রনাথ বসুর কন্যা রমারানীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৩০ সালে শুরু হলো অল ইন্ডিয়া রেডিও। ওই সময় বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে 'মহিলা মজলিস' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় হয়। ১৯৩১ সালে আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' প্রসারণ শুরু হয়। অনুষ্ঠানটির রচনা ও প্রবর্তনা করেছেন বাণীকুমার; গ্রন্থনা ও শ্লোকপাঠ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং সঙ্গীত-পরিচালনা করেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। তৎকালীন বহু প্রথিতযশা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে অমরত্ব প্রদান করেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় সুমিত্রা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, উৎপলা সেন, সুপ্রীতি ঘোষ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, শ্যামল মিত্র, অসীমা ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহলোকের অন্তিম যাত্রার মর্মস্পর্শী ধারাভাষ্য প্রসারিত হয়েছিল আকাশবাণী থেকে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্তাচলগামী রবির শেষযাত্রার বিবরণ দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১৯৬২ সালের ২ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শেষযাত্রার ধারা ভাষ্যকারও ছিলেন শ্রীভদ্র।

রেডিও ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর সাবলীল পদচারণা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা সবেতেই ছিল। একজন নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।

আকাশবাণীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার ছিলেন তিনি। একাধারে ক্রীড়াজগতের ধারাভাষ্যকার, অপরদিকে গান, নাট্যরচনা, প্রযোজনা সবেতেই ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর উপস্থাপনায় শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দেবার অনুষ্ঠান 'সবিনয় নিবেদন' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেইরকম অবিস্মরণীয় তাঁর 'বিরূপাক্ষের আসর।' শ্রীভদ্রের প্রচেষ্টায় আকাশবাণীর পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক নাটক প্রসারণ শুরু হয়। তাঁর দিশানির্দেশে রেডিওতে অনুষ্ঠানগুলি বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— আবৃত্তি, ঐতিহাসিক রচনা, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, গল্প বলার আসর, পৌরাণিক কাহিনি, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

রেডিওর জন্মলগ্নেই এইরকম একজন আত্মনিবেদিত, পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বের জন্য রেডিও অনায়াসে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আম জনতার মধ্যে। আজকের যে সাফল্য ও বৈচিত্র্য আমরা রেডিওতে পাই তার ভিত্তিপ্রস্তর রেখেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১৯৭০ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি আকাশবাণী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৯১ সালের ৩রা নভেম্বর ছিয়াশি বছর বয়সে এই বহুমুখী প্রতিভা অধিকারী পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রেডিওর স্বর্ণযুগের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন তিনি। অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসত চণ্ডীপাঠ করার জন্য। চেষ্টা করতেন যথাসময়ে ওই অনুষ্ঠানে পৌঁছে যেতে। চণ্ডীপাঠ এবং সংস্কৃতভাষাকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে অগ্রণী ছিলেন তিনি।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর স্মৃতিভ্রম হয়। তারপর নীরবে এই ইহলোক থেকে বিদায় নেন দেবী চণ্ডীর মানসপুত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ■

চিঠিপত্র

আত্মনিবেদনের শতবর্ষে বাঘাযতীন

'স্বস্তিকা' পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যাটি পড়লাম। এই সংখ্যাটি 'আত্মনিবেদনের শতবর্ষে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন)' বিশেষ সংখ্যা হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতি ভুলে গেছে কত বিপ্লবীর রক্তের বিনিময়ে আত্মোৎসর্গের হোমানলে দুর্লভ স্বাধীনতা পেয়েছে। চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায়ের লেখা 'কয়াভূমিপুত্র যতীন্দ্রনাথ', অভিরূপ নাগচৌধুরীর 'তিনি মরলেন দেশ জাগলো', স্বামী প্রেমানন্দ গিরির 'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ও স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী' (সমসাময়িকের চোখে বাঘাযতীন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত) এবং 'জয়শ্রী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'যতীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'— চারটি প্রবন্ধ পড়ে ভাল লাগলো।

স্বামী বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক চিকাগো বক্তৃতা দ্বারা পাশ্চাত্য বিজয় করে স্বদেশে ফিরলে ১৭ বছরের যুবক যতীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁকে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অভিনন্দন সভায় তাঁকে দেখেন এবং পরে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন আর সেইসঙ্গে দেশমাতৃকার মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্যক পরিচয় পেয়ে লিখেছিলেন— 'A young man came to me whose one idea is to make Swamiji's name, the rallying point for young India. He is wild about him and he is such a strong man himself. He is independent and a Brahmin !'

(সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ/পৃথ্বীন্দ্রনাথ ঘোষ)

আবার বিপ্লবের গুরু অরবিন্দ ঘোষ যখন মহাযোগীরূপে পণ্ডিচেরিতে শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন তাঁর মুখ থেকে জানা যায় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উক্তি— 'অদ্ভুত লোক ! যখন মনুষ্যজাতির মধ্যে একেবারে প্রথম শ্রেণীর পুরুষ। সৌন্দর্যের আর তেজের এমন সমন্বয় আমি দেখিনি। দেহের গড়নও যোদ্ধার মতো।' এজাতীয় লেখা যত বেশি প্রকাশ করেন ততই দেশে ছাত্রযুব সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে। কারণ বর্তমান মূল্যবোধহীন সমাজে তারা দিশা খুঁজে পাবে, চিনবে আপন অস্তিত্বের শিকড়কে।

—**নিতাই নাগ** (শিক্ষক),
চাঁদমারি ডাঙা, বাঁকুড়া।

প্রসঙ্গ স্বস্তিকা

আটষট্টি বরষে পড়িলে অভিনন্দন তাই,
প্রকাশ পেলেই শনিবারে আমার পড়া চাই।
সব সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা যত্নে দিই রেখে,
বহু বছর আগেই তোমার চিত্রটি নিই এঁকে।
স্পষ্টকথা, স্পষ্টভাষায় বলার ভুল নাই,
শত বরষ থাকো তুমি যেন গো দেখতে পাই।
শত-শত বর্ষ থাকো এই কামনাই আজ—
সবার হাতে, সবার ঘরেই স্বস্তিকা ঠাঁই পাক।

—**অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
পার্কস্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার

সম্প্রতি প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে পশ্চিমবাংলার হিন্দু মহিলাদের বিশেষ করে স্কুল ও কলেজ পাঠরতা মেয়েদের উপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীর অবমাননা, শ্লীলতাহানি, এমনকী জোরপূর্বক অপহরণ করে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এই সব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা শাসকদল আশ্রিত। শুধুমাত্র ভোটের আশায় এই সব নারকীয় ঘটনা মুখ বুজে সহ্য করে আসছে। সব থেকে বড় আশ্চর্যের বিষয় শাসকদলের সমর্থক হিসাবে নিজ সমাজের মহিলাদের নিত্য অত্যাচারিত হতে দেখে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছে। এই ভেবে যে পাছে তৃণমূলের রোষে পড়ে সেকুলারবাদী তকমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

মনে প্রশ্ন জাগে, কেন হিন্দুরা আজ নিজেদের মেয়েদের অপমানিতা ও ধর্ষিতা হওয়া দেখেও মুখ বুজে চুপ করে আছে— প্রতিবাদ না করে। কিসের ভয়ে? এই প্রশ্নটি আমাদের হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে না? নিজ রাজ্যে সংখ্যাগুরু হয়েও কেন আজ পরবাসীর জীবন যাপন করছে।

আর কতদিন হিন্দু মেয়েরা বিশেষ করে মুসলমান প্রধান জেলাগুলোতে যেমন— মালদহ, নদীয়া, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ভয়ে ভয়ে স্কুল ও কলেজ যেতে বাধ্য হবে? কেন তারা কোনো প্রকার নিরাপত্তা সরকারের তরফ থেকে ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে না হয় নাই পেল, কিন্তু এই সব অঞ্চলের হিন্দু ভাইদের কাছ থেকে সাহায্য পাবে না? এটাই বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে সব থেকে বড় প্রশ্ন হওয়া উচিত।

স্কুল-কলেজ পাঠরতা বোনেদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে তারাও যেন নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই সমস্ত নরপশুদের উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক দু'একটি শিক্ষা দিতেও যেন পিছপা না হন। এমনিতে তো ধর্ষিতা হয়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে। তাহলে দু'একটা দুষ্কৃতীকে উচিত শিক্ষা দেওয়াটাই শ্রেয় ও দৃষ্টান্তমূলক নয় কি?

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সিরহাট, হাওড়া।

হিন্দুত্ববাদীরা কী ভীরু নাকি উদাসীন?

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

কিছুদিন আগে কংগ্রেস কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পুনের একটি জনসভায় বলেছেন, 'আর এস এসের লোকেরা ভীরু, ওরা হৈ চৈ করে, কিন্তু একবার যদি বাধা দেওয়া যায় তাহলে ওরা দু' মিনিটের মধ্যেই লেজ গুটিয়ে পালাবে।' এই উক্তি বিষয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারিনি। তাদের পক্ষ থেকে বক্তাকেই সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

(১) যোগী আদিত্যনাথ-সহ কয়েকজন বিজেপি এমপি বলেছেন 'লাভ জেহাদ'-এর ফলে হিন্দু ছেলেমেয়েরা মুসলমানকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অমনি বাম-সহ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা রে রে করে উঠলেন। অনেক বুদ্ধিজীবী রাতারাতি পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ লিখে দেখালেন এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অমূলক এবং এটির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আছে। ব্যস, অমনি বিজেপি এমপি-কে সাবধান করে দেওয়া হলো এমন উক্তি আর না করতে।

(২) হিন্দুদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এক হিন্দুত্ববাদী নেতা 'ঘর বাপসি' আন্দোলনের কথায় বললেন যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। অমনি বিরোধীরা প্রতিবাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি নেতারা বললেন— এ তাঁদের দলের নীতি নয় এবং যিনি এমন উক্তি করেছিলেন তাঁকে তিরস্কার করা হলো।

(৩) উমা ভারতী দাবি করলেন স্কুলস্তরে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে হবে। ব্যস, আবার বিরোধীদের বক্তব্য—এটা আর কিছু নয়, এটা হলো হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা। অমনি বলা হলো না না, এমন পরিকল্পনা আমাদের নেই।

(৪) সাক্ষী মহারাজ বললেন, মাদ্রাসায় মুসলমানদের সন্ত্রাস শেখানো হচ্ছে। অমনি বিরোধীদের প্রতিবাদ এবং দলীয় নেতাদের তাৎক্ষণিক পশ্চাদপসরণ শুধু তাই নয়, সার্টিফিকেট দান করা হলো মুসলমানরা দেশপ্রেমিক।

(৫) সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী মুসলমানদের ভারতের প্রতি আনুগত্য নেই বলেছিলেন। অমনি বিরোধীরা এটিকে 'হেট স্পিচ' আখ্যা দিলেন। এর প্রতিবাদ করা হলো যেমন করেছিলেন হিন্দুত্ববিরোধীরা।

এইরকমই ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলা, হজযাত্রা এবং মাদ্রাসার জন্য অনুদান বাতিল, ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ ইত্যাদির কথা যখনই উঠেছে তখনই এইসব নেতারা সেই দাবিতে জল ঢেলে দিয়েছেন। অথচ নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁরা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

একটা প্রশ্ন জাগে— কেন এই পশ্চাদপসরণ? যে হিন্দুত্ববাদীরা এই সব দাবি করেছেন তার সত্যতা ও যাথার্থ্য তো অস্বীকার করা যায় না।

যেমন—(১) একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতে প্রতি বছর লাভ জেহাদের প্রক্রিয়ায় ৪ হাজার ছেলেমেয়ে মুসলমান হচ্ছে। গত ৩০-এর দশকে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখক বলেছিলেন লাভ জেহাদ মুসলমানদের ধর্মান্তকরণের একটি অঙ্গ। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন একটি শহর কয়েক ঘর মুসলমান বাস করত। একশো বছর পরে দেখা গেল সেই শহরে কয়েক ঘর বাদে সবাই মুসলমান হয়ে গেছে অমুসলমান ছেলে এবং মেয়ে বিয়ে করে।(২) রাষ্ট্রসঙ্ঘ তো বটেই, পাকিস্তান পর্যন্ত স্বীকার করেছে মাদ্রাসায় সন্ত্রাস শেখানো হয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ২০১২-'১৩ সালে ২০৯ কোটি টাকা অর্থ মঞ্জুর করেছে।(৩) সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী মুসলমানদের ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখানোর কথা বলেছেন। এটি নাকি হেট স্পীচ। কেন হিন্দুত্ববাদী নেতারা বলছেন না মসজিদে প্রতি শুক্রবার নামাজ পাঠের পরে ইমামরা উত্তেজক ভাষায় ইসলামের 'যুদ্ধ করে দেশ জয়ের অতীত কাহিনি' উল্লেখ করে আগামীদিনে ভারত-সহ সমস্ত বিশ্বকে ইসলামায়িত করার প্ররোচনা দিচ্ছে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর দেড়শো বছর আগে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন।(৪) মজার কথা, মুসলমানরা সারা পৃথিবীর ইসলামিকরণ চাইছেন, অথচ ভারত হিন্দুরাষ্ট্র বললে তার বিরোধিতা করছেন। (৫) ঘর বাপসি আন্দোলন করলে বিরোধীরা রে রে করছেন এবং হিন্দুত্ববাদীরা ভয়ে চুপসে যাচ্ছেন। কেন তাঁরা বলেন না যে, মুসলমান নেতাদের উগ্র প্রচারে সারা বিশ্বে প্রতিদিন ৫০০ ব্যক্তি মুসলমান হচ্ছে।হিন্দুদের ধর্ম প্রচারেই দোষ? (৬) প্রায়শই বাবরি ভাঙার উদাহরণ দেওয়া হয় এবং তা শুনে হিন্দুত্ববাদীরা চুপ করে থাকেন। তাঁরা একবারও জবাবের মতো জবাব দেন না এই বলে যে ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাস হলো মন্দির ভাঙার ইতিহাস। কবি মহম্মদ ইকবাল লিখেছেন, সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে সুলতান মামুদ একজন সাচ্চা মুসলমানদের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এটা দুঃখের বিষয়, কাশ্মীর রাজ্যের মানুষ এখনও নিজেদের ভারতের বাইরে আলাদা রাষ্ট্রের মানুষ ভাবে। অথচ সরকার তাদের বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন শক্ত হাতে মোকাবিলা করছে না। ৩৭০ ধারা তুলে দিলে তাদের বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলনের মূলে বিরাট আঘাত আসতো।

মোট কথা, হিন্দুত্ববাদী নেতাদের অবস্থা কবি কামিনী রায়ের ভাষায় 'সদা ভয় সদা লাজ... পাছে লোক কিছু বলে'। এই ভয় এবং লাজ, সেই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদীশক্তিকে খুশি করার মানসিকতা থেকে হিন্দুত্ববাদী সরকার বিরোধীদের কাছে যে হাস্যাস্পদ হয়ে চলেছে তা রাহুল গান্ধীর ভাষায় স্পষ্ট। ইতিহাস বলে, বিরোধীদের খুশি করার অর্থ নিজেদের পতন ডেকে আনা। যেমন পতন হয়েছিল প্রথম এনডিএ সরকারের। ■

কালাত্মক পরমেশ্বরী দুর্গা

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

যুগ আসে যায়। যুগের পর আসে বৎসর, মাস দিন। বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে শ্রীদুর্গার অপরিসীম আকর্ষণ যুগ হতে যুগান্তরে ক্রমান্বয়ে চক্রকারে প্রবহমান অন্তঃসলিলা ধারায় মানুষের গভীর মননে প্রতিধ্বনিত আশ্বাসের এক চিরন্তনী। গোমুখ হতে গঙ্গাসাগরের প্রবহমান ধারার ন্যায় আজও বয়ে চলেছে সনাতন ধর্মের যুগক্রমান্বয়ের শ্রীশ্রীমা দুর্গার পূজা-অর্চনা। যুগ আসে, যায়, শুধু ঘটে যায় পরিবর্তন আর রূপান্তর। একই সেই ব্রহ্মশক্তি সাকার-আকার-নিরাকারের মায়া ধীশ চক্রাকারের ন্যায় এক মানবীয় দেবী রূপ। যাঁকে শ্রীদুর্গা, দশভুজা, চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা রূপে মর্তের মানুষ এই সংসার অরণ্য থেকে মুক্তির আশা নিয়ে আরাধনা করে আসছে নানা বিবর্তন, নানা রূপের পরিবর্তন, কালচক্রের প্রবহমান ধারাতে। তাঁকে আমরা যে নামেই ডাকি, তিনি ভক্তের ডাকে নানাভাবেই সাড়া দিয়ে থাকেন। সেই দুর্গাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এ যুগের জীবন্ত দুর্গা, সবার মা, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। তাঁরই আকুল আহ্বানে, তাঁরই ভক্তিতে ধরা পড়ে যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে, সেই তাঁর দেখা পাবে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নিজমুখেই ব্যক্ত করেছেন তাঁরই এক ভক্ত সরযূবালাদেবীকে। শ্রীশ্রীমায়ের কথায়, 'এই সেদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র মারা গেল, আহা! সে কত ভালো ছিল, ঠাকুর তাদের বাড়ি যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত দু'শো টাকা ট্রামে তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ি এসে দেখে ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে— 'হায় ঠাকুর, কী করলে!' তার অবস্থাও তেমন ছিল না যে নিজে ওই টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে কাঁদতে দেখে ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন, 'কাঁদছিস কেন? ওই গঙ্গার ধারে ইঁট চাপা আছে দ্যাখ্'। সে তাড়াতাড়ি উঠে ইঁটখানা তুলে দেখে সত্যই তো একতাড়া নোট। শরতের কাছে এসে সব বললে শরৎ শুনে বললে, 'তোরা তো এখনো দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাইনে।' ওরা পাবে কি? ওরা তো দেখে শুনে গ্যাঁট হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশি।'

ভারতের সনাতন ধর্মের যুগ-ইতিহাস যদি আমরা মন্থন করি, দেখব কত অবতার এই ভারতভূমির বুকে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তের আকুলতায় যুগ হতে যুগান্তরে নানা রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করে চলেছেন, যা যুগচক্রকে আমাদের মনে করে দেয় সনাতন ধর্মের দশ অবতার চক্রের মাধ্যমে। সেখানে দেখা যায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগে ক্রমান্বয় অবতারের রূপ পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে ভক্তবৎসল হয়ে উদ্ধার করেছিলেন। মৎস্য, বরাহ, নৃ-সিংহ ইত্যাদি রূপে এইভাবে দশ অবতারের আবির্ভাব জগৎমাতার সৃষ্টিকে যেন আরও রমণীয় করে তুলেছে। সেই কারণে ক্রমান্বয়ের বিভিন্ন যুগের রাজন্যবর্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক রূপরেখা আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। সেখানে কালনির্ণয়ের বিফল প্রয়াস ভক্ত হৃদয়ে স্থান পায় না।

ভারতীয় সভ্যতা অতি সুদূর অতীতের সভ্যতা। এই অন্ধকারের অতি প্রগাঢ় ব্যবধানের মধ্যে সেই সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা শক্তি আরাধনাকে সকল যুগের সঙ্গে এক রূপ পরিগ্রহ করে; যাকে আমরা শক্তির আর এক রূপ কালী-দুর্গা রূপে অর্চনা করি।

কবিকণ্ঠে সুরধ্বনি উঠেছে—'মায়ের মহিমা অপার রূপে'। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গানে— ''নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি! তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী''— আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এসেছে 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি'। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগেও তিনি পূজিত হয়ে আসছেন। চলবে কালের নিয়মে তাতে দ্বিমত নেই।

ভারতীয় সভ্যতার সময় যুগকালের পরিসীমা নির্ণয় করে জানা যায় না— এক একটি যুগের পরিসীমা বহু লক্ষ বৎসর ধরে। তিনি জনসমাজে ভক্তের কল্যাণে রাজা মহারাজাদের ধনী গরিব ভক্তের শরণাগত হয়ে রক্ষা করেছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যেমন ত্রেতা যুগে রাজা শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল বোধনের বিস্তৃত বর্ণনা সকলের হৃদয়গম্য, তেমনি দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে, মধুকৈটভ বধের জন্য ব্রহ্মা পর্যন্ত। অপর দিকে ত্রিপুর নামক অসুরকে নিধন করার জন্য মানসে ত্রিপুরারি শিবজী শ্রীদুর্গার আরাধনা করেছেন। ইতিহাসের নিরিখে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, কী বিশাল, ব্যাপক সময় ধরে শ্রীদুর্গা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিতে অধিকার বিস্তার করে সদা মহালীলা করে চলেছেন। সেই কালপ্রবাহ যদি আমরা নিরীক্ষণ করি দেখতে পাই, বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব থেকে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত যে সকল প্রধান প্রধান নৃপতি যে কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং যে কাল-মধ্যে যে যে অবতার অবতীর্ণ হয়ে ভার লাঘব করেছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থে তার ভুয়োভুয়ো উল্লেখ আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তা উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রমতে মানবীয় বর্ষের প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার পূর্বে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্যযুগ আরম্ভ। এই সত্যযুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতার চতুষ্টয়— মৎস, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃ-সিংহ। যে সকল নৃপতি এই সত্যযুগে পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাদের প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম— বৈবস্বত মনু, ইক্ষ্বাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, কার্ত্যবীর্যার্জ্জুন। এইসকল নৃপতির নাম হতে বুঝতে পারা যায় বৈবস্বত মনুর সত্যযুগে সাধারণত সূর্যবংশীয়গণ এবং কখনও কখনও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ভারতে একাধিপত্য লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রমতে, এই সত্যযুগে মনুষ্য লক্ষ বছর পর্যন্ত পরমায়ু লাভ করতে পারতেন। মানবদেহের উচ্চতার পরিমাণ ছিল একবিংশতি হস্ত। তখন মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন ছিল। সত্যযুগের অন্তে ত্রেতাযুগের আরম্ভ। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি। ত্রেতাযুগের পরিসর— ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর। এই যুগের অবতার--- বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র। এই যুগের ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বর্ষকাল সূর্যবংশীয় নৃপতিগণ পৃথিবীতে একছন্দ্র প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ককুৎস, ত্রিশঙ্কু, মৃত্যুঞ্জয়, সগর, অংশুমান, দিলীপ, ভগীরথ, রঘু, অজ, শ্রীরাম, লব, কুশ বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। ত্রেতা যুগের মনুষ্য দশ সহস্র বর্ষ পরিমিত আয়ুর অধিকারী ছিলেন। মানবদেহের উচ্চতার পরিমাণ চতুর্দশ হস্ত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশ তিথিতে গুরুবারে দ্বাপর যুগের প্রত্যাবর্তন। এই যুগের অবতার কৃষ্ণ, বলরাম। এই যুগে প্রতিষ্ঠিত নৃপতিগণের নাম— শল্য, বিরাট, কুশধ্বজ, শান্তনু, যুধিষ্ঠির, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কংস। মানুষের পরমায়ুর পরিমাণ সহস্র বর্ষ। মাঘী পূর্ণিমার শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। কালিযুগের পরিসর ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ। মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ শতবর্ষ। কলিযুগের প্রথমাংশের যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জন্মোজয়, শতামিক, বিক্রিমাদিত্য প্রমুখ শতসংখ্যক চন্দ্রবংশোদ্ভূত রাজার রাজত্বকাল ছিল। এরূপ ৩ হাজার ৬ শত ৯৩ বৎসর ৩ মাস ৫৮ দিন রাজত্ব করেন। তারপর বৈদেশিক আধিপত্যের সূচনা হয়।

বিভিন্ন যুগের ও কালের সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করার পর আমাদের মনে হতেই পারে, তাহলে ঈশ্বরের বা করুণাময়ী দুর্গার অতি অলৌকিক গুণাগুণ, তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করে কী লাভ হতে পারে? এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এক প্রতিফলিত রূপ মানবমনে ভাবের প্রতিফলিন করতে পারে। স্বয়ং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটি স্মৃতিকথায় ব্যক্ত করেছেন, 'আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসে আছি, কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ একসময় কক্ষ থেকে বাইরে গেলেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই সেই অবসরে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচার আরম্ভ করেন। তিনি পুনঃ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে করতে বললেন— ''চুপ কর তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা এভাবে বিচার করে কী লাভ বল দেখি। তাঁর মহিমা বুঝতে হলে স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণা দিয়ে করতে হয়, তর্ক করে কি তা বোঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময় একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস? এই যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হলো— এ কি করুণা নিদর্শন? তোরা হয়তো বলবি, এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হলো। কিন্তু আমি তর্ক করে বলব— যিনি সর্বশক্তিমান, একদিক সৃষ্টি করতে হলে কি তাঁকে আবার একদিকে ধ্বংস করতে হবে? শত শত অসহায় শিশু, নারী, বালক, বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায়।''

একজন ভক্তশ্রোতা অসহিষ্ণু হয়ে বলে— 'তবে কি বলতে হবে, ঈশ্বর নিষ্ঠুর!' শ্রীরামকৃষ্ণদেব দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন— 'আরে বোকা, কে তোকে তা বলতে বলেছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে, তাঁর অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে। তাই বলছিল কাতর হয়ে, যুক্তকরে শুধু এই প্রার্থনা কর— ঈশ্বর! তোমার মহিমা বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে দাও। সেই কারণেই আমরা দেখি, সাধক প্রেমিকের গানে— 'ত্বং অপারা, বিশ্বসারা, বিশ্বধারা, বিশ্বরঞ্জিনী / সর্বভূত-আত্মভূত, সর্ববিভূতি-প্রবিধায়িনি।।'

ভক্তকবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়—

'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী। শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হলো মার রূপের ডালি।' কারণ তিনি তো অনন্ত রূপিনী-অনন্ত গুণবতী অনন্তনাম্নী গিরিজে মা-সকলের পরমেশ্বরীদুর্গা।

(লেখক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী)

আনন্দময়ী-জননী মোক্ষদাসুন্দরী

রূপশ্রী দত্ত

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা জগন্মাতা। বাল্যকাল থেকে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে তাঁকে কেন্দ্র করে। তিনি ভক্তদের কাছে অন্তর্যামিনী। কেউ কেউ নিজ ইষ্টদেবীকেও তাঁর মধ্যে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই তাঁর আশ্রম। আমাদের আলোচ্য, মা আনন্দময়ীর জননী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী।

মোক্ষদাসুন্দরী দেবী যেহেতু মা আনন্দময়ীর মা, তাই তিনি সকল ভক্তজনের শ্রদ্ধা ও আদরের 'দিদিমা'। সর্বজনের প্রতি সুন্দর ব্যবহার, নিরভিমানতা, অতিথিপরায়ণতা, সহনশীলতা, সত্যে নিষ্ঠা ও সর্বোপরি সদা সন্তোষ--- দিদিমা-র চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এরূপ দিব্যগুণান্বিতা ও দিব্যশক্তির আধার ছিলেন বলেই মা আনন্দময়ীর মতো 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ'কে তিনি সন্তানরূপে লাভ করেছিলেন।

১৯৩৭ সালে মায়ের পিতা অর্থাৎ মোক্ষদাসুন্দরীর স্বামী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের মহাপ্রয়াণের পর, যখন দিদিমা মায়ের সঙ্গে থাকতে চাইলেন, মা তখন তাঁকে সন্ন্যাস নেবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সেই অনুসারে ১৯৩৯ সালে অধ্যাত্মপথের অতি উন্নত সাধক, নির্বাণী আখড়ার মোহন্ত মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলানন্দগিরিজীর কাছে দিদিমা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী নামে সর্বজনসমক্ষে পরিচিত হন। এই

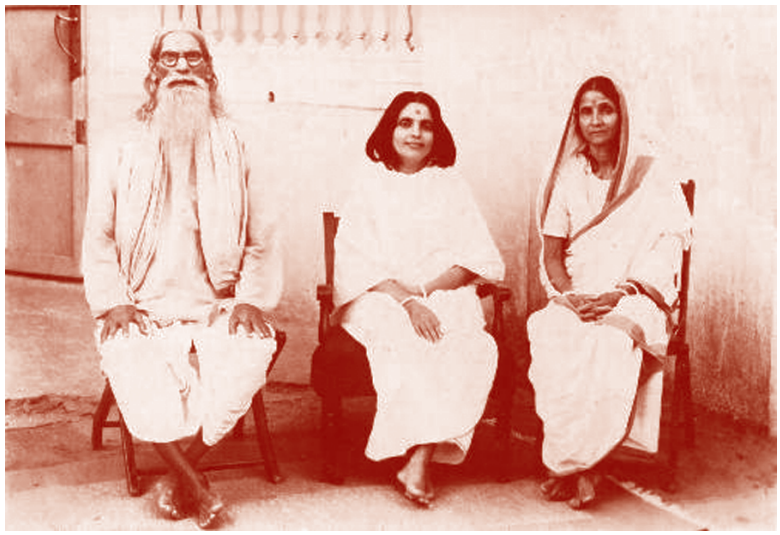

বাবা বাঁ পাশে, মা মোক্ষদাসুন্দরী ডান পাশে, মাঝে মা আনন্দময়ী

শুভ অনুষ্ঠানের ৭৫ বছর গত ১৪ এপ্রিল, ২০১৪ চৈত্র সংক্রান্তির দিন গিরিজীর 'কৌস্তভ সন্ন্যাস উৎসব' বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু ভক্ত তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি নিয়মস্বরূপ একটি হরিতকী মাত্র দক্ষিণা নিয়ে দীক্ষা প্রদান করেছেন। বেশিরভাগ সময় তাঁর জপের মধ্যেই অতিবাহিত হোত। তিনি বলতেন— 'যারা সাংসারিক ব্যস্ততায় জপ করতে সময় পায় না, তাদের জন্যই জপ করি।' অতি সারল্য ও অমায়িকতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর গৃহস্থাশ্রমে গৃহে কোনো ভিখারি এলে তিনি নিজের খাদ্য তাকে প্রদান করে ও নিজে জলপান করে পরম সন্তোষ লাভ করতেন।

শ্রী অরবিন্দও পণ্ডিচেরীতে গিরিজীকে দেখে বলেছিলেন 'What a wonderful flower she is'। 'জহুরি জহর চেনে'।

একবার আশ্রমের রান্নাঘরের কর্মরতা একটি মেয়ের ইচ্ছে হয়েছিল আশ্রমের হলঘরে বেজে চলা বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড শুনতে। কিন্তু সে কুণ্ঠায় যেতে পারেনি। দিদিমা অর্থাৎ গিরিজী তাকে হাত ধরে এনে বসিয়েছিলেন— অন্তর্যামিনীর মতো।

শিশুর মতো সরল ছিল মাতাপুত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার। একবার ঝড়ে খেওড়া গ্রামের ঘরের চাল উড়ে গেলে মা হাততালি দিয়ে শিশুর মতো বলে উঠেছিলেন— 'মা দেখ। ঘরের মধ্যে বসেই আকাশের তারা দেখা যায়। বাইরে যাবার দরকার নেই। কী সুন্দর।' দিদিমা বলেছিলেন— 'তুইও যেমন, তোর কথাও তেমনই।' সন্তানদের উপর দিদিমার কড়া শাসন ছিল— মিথ্যা কথা না বলা, বড়দের কথা শোনা, পরের দ্রব্য ঘরে না আনা ইত্যাদি।

নিজের আশ্রিত ভক্তদের তিনি নির্বিঘ্নে ভবসাগর পার করাতে চেয়েছিলেন। জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে যেন তারা না জড়িত হয়। এ বিষয়ে ভবকাণ্ডারি, নৌকা ইত্যাদি তাঁর অলৌকিক দর্শনও হয়েছিল।

মা আনন্দময়ীর জননী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী তথ্য মুক্তানন্দ গিরিজীর চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। ■

দুষ্টের ছল

মদোৎকট নামে এক সিংহ ছিল।

সে অঞ্চলে মদোৎকটের মতো পরাক্রমশালী সিংহ আর ছিল না। বনের পশুরা তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। তিনটি সহচর ছিল মদোৎকটের —একটি নেকড়ে বাঘ, একটি শিয়াল আর একটি কাক। সিংহটি ছিল যেমন ভয়ঙ্কর, তার বন্ধুরা ছিল তেমনি কুটিল।

একবার দলছাড়া নিরীহ একটি উটের দেখা পেল তারা। মদোৎকট বলল, 'বন্ধুগণ, এই

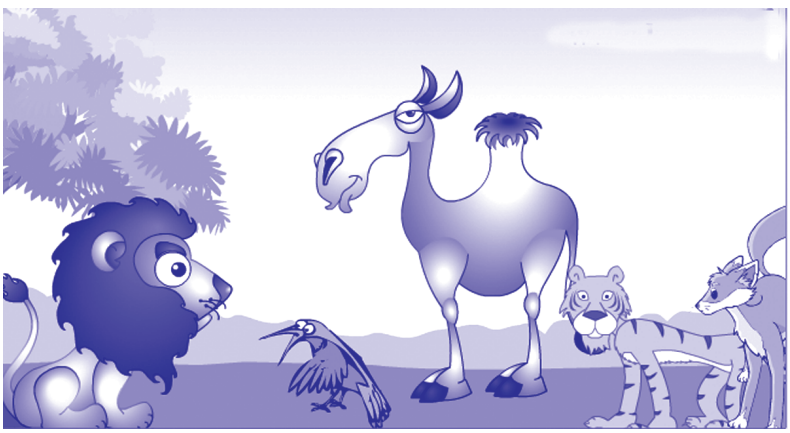

নিরীহ উটটি আমাদের অতিথি। আমরা একে গ্রহণ করব। তোমরা রাজি তো?'

বন্ধুরা বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনি যা ইচ্ছা করবেন, আমরা তাতেই রাজি।'

তখন সেই সিংহ, নেকড়ে, শিয়াল আর কাক গিয়ে উটকে বন্ধু বলে গ্রহণ করল। এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে উট বলল, 'আমি আপনাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করব।'

তারপর সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করল, আমরা পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে থাকব। একের বিপদে অপরে সাহায্য করব। আমাদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য হবে না।

সেই থেকে পাঁচ বন্ধু সুখে বাস করতে লাগল।

কিছুদিন পরের কথা। একবার একটা পাগলা হাতির সঙ্গে মদোৎকটের ভীষণ লড়াই হলো। কে হারে, কে জেতে বলা শক্ত, এমন সময় পাগলা হাতি দাঁত দিয়ে মদোৎকটের বুকে এমন গুঁতো দিল যে, মদোৎকট বাপ বাপ বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এল। সেই থেকে বুকের ব্যথায় মদোৎকটের বীর-দেহে আর নড়াচড়ার শক্তি রইল না।

বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে মদোৎকট পড়ে রইল। শিকার করা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হয় না। তাই তাকে উপোশ করে থাকতে হয়। আবার মদোৎকট শিকার না করলে তার বন্ধু— নেকড়ে, শিয়াল আর কাককেও না খেয়ে থাকতে হয়। এতদিন মদোৎকটের প্রসাদ খেয়েই ওরা বেঁচে ছিল। কেবল উটের খাদ্যকষ্ট ছিল না; তবু বন্ধুদের কষ্টে সে-ও মনে দুঃখ পেল।

একদিন উট গেছে ঘাসের সন্ধানে। সেই সুযোগে কাক, শিয়াল, আর নেকড়ে এসে মদোৎকটকে বলল, 'মহারাজ, ক্ষিধের জ্বালায় আমাদের প্রাণ যায়। কিন্তু আপনার কষ্ট আর আর সহ্য করতে পারছি না। একে গায়ের বেদনা, তার উপর ক্ষিধের জ্বালা। আমাদের অনুরোধ তৃণভোজী উঠটাকে খেয়ে প্রাণ-রক্ষা করুন।'

মদোৎকট বলল, 'ছি ছি! এমন পাপের কথা মুখে এনো না! উট আমাদের বন্ধু। না খেয়ে প্রাণ গেলেও বন্ধুকে খেয়ে বাঁচবার সাধ আমার নেই।

কাক, শিয়াল আর নেকড়ে বলল, 'তা হলে আমরা খুঁজে দেখি কোনো শিকারের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।'

এই বলে তারা শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর যেতেই কাক বলল, 'ওই দেখ, উট বেচারা খেয়ে-দেয়ে আরাম করে মদোৎকটের কাছে যাচ্ছে।'

নেকড়ে বলল, 'আমরা না খেতে পেয়ে যত শুকোচ্ছি, ও যেন ততই মোটা হচ্ছে।'

শিয়াল বলল, 'কোনো একটা উপায় করে ওকে খাওয়া যায় না কী?'

কাক বলল, 'তোমরা যদি তাই চাও তো আমি একটা উপায় করে দিতে পারি। চল আমার সঙ্গে মদোৎকটের কাছে। আমি যা বলব, তোমরাও তাই বলবে।'

কাক, শিয়াল আর নেকড়ে মদোৎকটের কাছে ফিরে এল।

তারা দেখল, উট-বন্ধু মদোৎকটের পাশেই বসে আছে। কাক বলল, 'মহারাজ, আমরা অনেক চেষ্টা করে কোনো শিকারের সন্ধান পেলাম না। তাই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। কেননা, এরূপ কথিত আছে যে, যে-কুলে যে-পুরুষ প্রধান, তাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে হয়। অতএব, মহারাজ, আপনি আমায় আহার করে ক্ষুধা দূর করুন।'

কাকের কথা শুনে মদোৎকট বড় সন্তুষ্ট হলো। সে হেসে বলল, 'তোমায় খেলে তো পেট ভরবে না বন্ধু।'

শিয়াল বলল, 'মহারাজ, তা হলে আমায় খান। আমায় খেলে পেট ভরতে পারে।'

শিয়ালের কথা শেষ হতে না হতে নেকড়ে বলল, 'মহারাজ, খেতে যদি হয়, তবে আমায় খান। আমায় খেয়ে আমার অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ করে দিন। কেননা, বন্ধুর জন্য প্রাণত্যাগ করলে স্বর্গবাসই হয়ে থাকে।'

মদোৎকট বলল, 'ছি, ছি, তোমরা স্বজাতি। স্বজাতিকে খেলে যে মহাপাপ হবে!'

তখন উট বলল, 'বন্ধু আমায় খেয়ে যদি তোমার প্রাণ বাঁচে, তবে আমায় খাও।'

উটের কথা শেষ হতে না হতে সিংহ, নেকড়ে আর শিয়াল একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বধ করে পরম সুখে আহার করল। ■

রাজ্য পরিচিতি

পাঞ্জাব

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জাব রাজ্য। পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্ত। উত্তরে জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ রাজ্য। উত্তর-পূর্বে হিমাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণে হরিয়ানা ও রাজস্থান। পশ্চিমবঙ্গের মতো পাঞ্জাবও দেশভাগের সময় ভাগ হয়েছে। পাঞ্জাবের মাটি খুব উর্বর হওয়ার জন্য ভারতের শস্যভাণ্ডার বলা হয়। সতলুজ, রাভী, ব্যাস, চিনাব, ঝিলাম এই পাঁচটি নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে পাঞ্জাবকে পঞ্চনদীর দেশ বলা হয়। আয়তন ৫০ হাজার ৩৬২ বর্গকিলোমিটার। রাজধানী চণ্ডীগড়। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৩২ হাজার ৩৩৮ জন। বেশিরভাগ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। জনপ্রিয় উৎসব লোহরি, বসনত্ ও বৈশাখি। অমৃতসরের হরমন্দির সাহিব স্বর্ণমন্দির নামে পরিচিত। দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য শিখ গুরুদের বলিদানী পরম্পরা সারাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

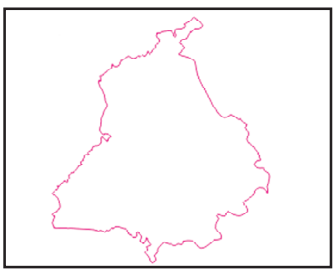

প্রশ্নবাণ

১. ভারতে অবস্থিত মরুভূমির নাম কী?

২. পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার কোন্ জেলাকে বলা হয়?

৩. পৃথিবীর ছাদ কাকে বলে?

৪. কোন্ নদীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হয়?

৫. ভারতের একটি অন্তঃসলিলা নদীর নাম কী?

উত্তর : ১. থর। ২. বর্ধমান। ৩. পামির মালভূমি। ৪. গোদাবরী। ৫. ফল্গু।

ছবিতে অমিল খোঁজ

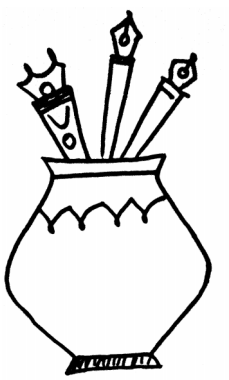

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) শ্যা বা র জা

(২) ম প ঙ্গ ল

২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) রক্ষণশীল (২) বটুকেশ্বর

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন রা মো ম হ

(২) ন্দ্র শ ৎ চ র

২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) মানসপুত্র (২) চোখের বালি

উত্তরদাতার নাম

(১) নিশিরাম মণ্ডল, কালিয়াচক, মালদা।
(২) রিনিশা রায়, মুন্সীরহাট, হাওড়া।
(৩) বিদিশা চ্যাটার্জি, পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া।
(৪) পূজা বরাট, ছাতনা, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

মা-লক্ষ্মীর সংসার

সুতপা বসাক ভড়

‘লক্ষ্মী’ বলতে আমরা বুঝি ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তির দেবী। ঘরের মেয়ে-বউদের আমরা এই ‘মা-লক্ষ্মী’ রূপেই দেখে থাকি। নিজের মেয়ে থেকে শুরু করে অন্যের মেয়েকেও ‘লক্ষ্মী মা-আমার’ অনায়াসে সম্বোধন করা হয়। সেইরকম, বাড়ির বউকে ‘লক্ষ্মী-বউ’ বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি শান্ত-বুদ্ধিমতী গৃহিণীর ছবি ভেসে ওঠে আমাদের মনের মধ্যে। আবার ছোট্ট ছেলেকে ‘লক্ষ্মীছেলে’ বললে সেও খুশি, আমরাও খুশি। এইভাবে সংসারে যা আমাদের ভাল লাগে, আদরের, কাঙ্ক্ষিত তাদের আমরা ‘লক্ষ্মী’ নামের সঙ্গে জুড়ে নিতে ভালবাসি।

সাধারণত, ঘরের লক্ষ্মী বলতে আমরা বুঝি বাড়ির বউকে। এই ঘরের লক্ষ্মী সারাদিন পরিবারের মঙ্গলকামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সকালে তার কাজ হয় বাড়ি-ঘর-দোর পরিষ্কার করা। কারণ পরিষ্কার বাড়িতেই ‘মা-লক্ষ্মী’ আগমন হয়। যতই আধুনিক আমরা হই না কেন, বাসি বাড়ি কেউ রাখি না— যেভাবে হোক বাড়ি পরিষ্কার করতেই হয়। এরপর বাড়ির বউটি স্নান সেরে পূজা করে—সেখানেও সংসারের মঙ্গলকামনা। পুরনো রীতি মেনে চলা অনেক পরিবারে আজও লক্ষ্মীর ঝাঁপি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত।

ভাত রান্নার সময় চালের ভাণ্ডারকে প্রণাম করেই চাল বের করার রেওয়াজ আমাদের পরিবারের; আবার নেওয়া চাল থেকে একমুঠো তুলে রাখা— ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ যেন কখনও না ফুরায়— এ যেন অনাদিকালের সংস্কার এখনও বজায় আছে। আগে একটি আলাদা কৌটোতে ওই চাল তুলে রাখা হোত— প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে কাজে আসত। এখনও অনেক পরিবার এই প্রথাটি বাঁচিয়ে রেখেছে। গৃহলক্ষ্মীর আরেকটি দিক অর্থসঞ্চয়— সংসারের খরচ বাঁচিয়ে সামান্য কিছু হলেও তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রাখা। সিঁদুর, কড়ি দিয়ে সাজানো লাল রঙের ‘লক্ষ্মীর ঝাঁপি’ সত্যিই যেন মা-লক্ষ্মীর প্রতিভূ।

অনেক পরিবার খেতে বসে ইষ্টদেবকে নিবেদন করে খাওয়ার প্রচলন আজও ধরে রেখেছে। এইভাবে খেলে একটা তৃপ্তি আসে শরীরে ও মনে। লক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থান যেন এইসব পরিবারেই দেখা যায়। অন্নকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। অন্ন কখনও নষ্ট করতে নেই। চালেই মা-লক্ষ্মীর অবস্থান। সেই চালের অবমাননা করা আমাদের সংস্কৃতিতে নেই। একবার পূজনীয়া আনন্দময়ী মা নর্দমাতে ভাত বয়ে যেতে দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর

বক্তব্য ছিল যে তাঁরা সন্ন্যাসিনী— ভিক্ষান্নে তাঁদের দিনযাপন, সেই ভিক্ষান্নের যেন কখনও অবমাননা না হয়— এ ছিল তাঁর জীবন, তাঁর লোকশিক্ষা। সেজন্য থালায় যতটুকু ভাত প্রয়োজন ততটুকুই নেওয়া উচিত। খাবারের অপচয় যেন মা-লক্ষ্মীর সংসারে না হয়। আমাদের সংস্কারে চাল, দুধ, ঘি ইত্যাদি নষ্ট হওয়া অশুভ মনে করা হয়— এই ভাবে আমরা জন্ম থেকে সংস্কারিত হই অপচয় না করায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে আছে প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু আমাদের শোষণ সহ্য করতে অপরাগ। সেজন্য আমরা যেন প্রয়োজনের নামে প্রকৃতিকে শোষণ করে তার অপচয় না করি। আমরা যা পাচ্ছি— সবই প্রকৃতি দান (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে), সেই প্রকৃতিকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। একজন ঘরের লক্ষ্মী প্রতি পদক্ষেপে তার কর্তব্যনিষ্ঠার চিহ্ন রেখে যায়।

সোনা হারানো অমঙ্গল, সেজন্য ঘরের লক্ষ্মী সোনার যত্ন নেয়। এইভাবে— সঞ্চয়ের একজন সঞ্চয়কারিণী সে। জল বয়ে যাওয়া মানে অর্থ চলে যাওয়া। ঘরের লক্ষ্মী সদা তৎপর থাকে যাতে জলের অপচয় না হয়। এইভাবে সে জল-সংরক্ষণ করে চলেছে। ঘরের লক্ষ্মী আমাদের মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, সরল, সাধাসিধে জীবন-যাপনের প্রেরণা দেয়। এই হিন্দু মানসিকতায় বাড়ির বউ-য়ের ছবি— যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই— আছে শুধু এক অপরিসীম শান্তির অনুভূতি।

ঘরের লক্ষ্মীর কাছে শাড়ি, গয়না, আসবাব, খাদ্য প্রয়োজন বিলাসব্যসনের সামগ্রী হয়। সেজন্য সে ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুতে প্রথমে নিজে অভ্যস্ত হয় এবং পরিবারের বাকিদেরও তাতে অভ্যস্ত হবার প্রেরণা জোগায়। বেশি প্রয়োজন মানেই প্রকৃতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এইভাবে সবদিক রক্ষা করে চলে ঘরের লক্ষ্মী।

পার্থিব বস্তু কখনও মনের শান্তি দেয় না। সাময়িক ভাবে হয়ত একটু স্বস্তি আরাম হয়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ীত্ব নেই, চাহিদার শেষ নেই। একটি চাহিদা পূরণ হলেই আমরা আর একটি চাহিদার দিকে হাত বাড়ালে, সেটি পেলে আবার আরেকটির দিকে— এইভাবেই চলে আমাদের কখনও না শেষ হওয়া চাহিদার শৃঙ্খলা। অল্পেই সন্তুষ্ট আমাদের ঘরের লক্ষ্মীটি। আবার দান-ধ্যানও করে সে। সময়ের সদব্যবহার যে করে, সেজন্য সময়ও যথাসময়ে তাকে স্বীকৃতি দেয়।

ঘরের লক্ষ্মীর দায়িত্ব অনেক। কাজ অনেক। সন্তানদের যথাযথভাবে বড় করার দায়িত্বও তার। এই যে, আমরা প্রায়শ অভিযোগ করি যে নতুন প্রজন্ম উচ্ছন্নে যাচ্ছে— তার জন্য দায়ী কে? বড়দের জীবনশৈলী থেকেই তো তারা অনেকটা শেখে। মা’র দায়িত্ব অনেক। তাকে অনেক প্রলোভন ছাড়তে হয়। সংযমী হতে হয়। তবেই তাকে দেখে নতুন প্রজন্ম শেখে। এই শিক্ষা বই পড়ে হয় না, জীবন থেকে শিখতে হয়। মা-লক্ষ্মীর সংসারই আমাদের শান্তির পাঠশালা। ■

অলীক একনায়ক নরেন্দ্র মোদী

বাস্তবে মোদীর ক্ষমতা এমন সব তুচ্ছ বিষয়ে বিঘ্নিত হয়ে যাচ্ছে যা খাঁটি একনায়করা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না

অতিথি কলম

সদানন্দ ধুমে

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে পা রাখলেন সেখানে হাজার হাজার অনুরাগীর মধ্যে আমেরিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য প্রযুক্তি উপত্যকার ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তারা (চিফ একজিকিউটিভ অফিসার) তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পেরে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। অবশ্য এর সঙ্গে তাঁর তথাকথিত 'দমনমূলক নীতির' হাওয়া তুলে কিছু লোক অবশ্যই বিরোধিতার পোস্টারও দেখিয়েছে। এর সঙ্গেই হাত মিলিয়েছেন আমেরিকাবাসী কিছু শিক্ষাজগতের লোকজন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে মানবাধিকারের প্রতি অসম্মান করা, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, বিচারব্যবস্থাকে খাটো করা বা ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো অভিযোগ তুলে যৌথ স্বাক্ষর করা একটি চিঠির মাধ্যমে সেখানে ইতিমধ্যেই প্রচার চালাচ্ছে। তাঁরা বিনিয়োগে ইচ্ছুক সম্ভাব্য সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগ সম্পর্কে নিরুৎসাহ করে দিতে চাইছে।

বিরোধীরা বুঝতে পারেননি যে, কখন মশা মারতে কামান দেগে ফেলেছেন। তাঁদের সমালোচনা করার পরিমিতি জ্ঞানহীনতার ফলে মোদীকে খাটো করে একনায়ক বানানোর কৌশল তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতাকেও তলানিতে নিয়ে গেছে।

একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যাবে ভারতের মঙ্গলের জন্য এই অতি সক্রিয়তা যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ। যাঁরা এই প্রচারকে চটজলদি অর্থাৎ ফেস ভ্যালুতে নেবেন তাঁরা ভাবতে পারেন এই প্রগাঢ় পণ্ডিতবাহিনী হয়ত ভারতের বিশাল গণতন্ত্রের গতিকে চীন বা রাশিয়ার মতো একদলীয় সরকারের অধীনে থাকা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রণালীগুলির সঙ্গে এক পঙতিতে বসিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ বিরোধীরা প্রকৃত পরিস্থিতিকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে গুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, কখন মশা মারতে কামান দেগে ফেলেছেন। তাঁদের সমালোচনা করার পরিমিতি জ্ঞানহীনতার ফলে মোদীকে খাটো করে একনায়ক বানানোর কৌশল তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতাকেও তলানিতে নিয়ে গেছে। মোটামুটি তাঁদের যন্ত্রণার এই কারণটিকে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় 'Modi Derangement Syndrome' (মোদী মনোবিকারের উপসর্গ) বলেই নির্ণীত করা যেতে পারে। এই ব্যাধির ফলে মোদীর কাজকর্মের কোনো খোলাখুলি আলোচনা করতে গেলেই এঁরা কোনো রহস্য উন্মোচন বা অতি কথনের ভঙ্গিমায় ভাষণ দেন। আজ থেকে কয়েক বছর আগে একটি টিভি সাক্ষাৎকারে জনৈক প্রাজ্ঞ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকের সঙ্গে মোদীর নির্বাচনী সম্ভাবনা নিয়ে আমার বিতর্ক হচ্ছিল। তিনি হঠাৎ বললেন, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশেই গুজরাটে নরসংহার হয় যাতে বহু লক্ষ (তিনি বলেন কয়েক মিলিয়ন : ১০ লক্ষে ১ মিলিয়ন) লোক মারা যায়। অবশ্য আমার সৌভাগ্য ছিল ওই আলোচকের সম্ভবত অঙ্কের কোনো ডিগ্রী ছিল না।

লক্ষ্য করার বিষয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গত বছরে যেদিন থেকে মোদী ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সফল হয়েছেন সেদিন থেকেই তাঁর সমালোচকরা বাজারে গল্পের পর গল্পের স্রোত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন মোদী আসার পর

থেকেই ভারতের শাসনক্ষমতায় একটা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। (এঁদের মধ্যে বুকার প্রাইজ বিজয়ী ঘোর মোদী-বিরোধী শ্রীমতী অরুন্ধতী রায় তাঁকে 'পরমত অসহিষ্ণু একনায়ক' অবধি বলে ফেলেছেন)।

এই পণ্ডিতদের বিশ্লেষণে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে তীরে 'অত্যাচারীর বুটের' যে কল্পিত পদশব্দ তাঁরা শোনাচ্ছেন তাতে আদতে স্ফুটনোন্মুখ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভঙ্গুর ফুলটিকে সেই পদচাপে পিষ্ট করে পিণ্ড বানানোই হয়তো তাঁদের উদ্দিষ্ট।

হায় ভগবান! হতভাগ্য ভারতবাসী হয়ত এখনও তাদের দুর্দশা ও আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ নয়। নইলে গত সপ্তাহে বিশ্বখ্যাত 'Pew Rescarch Centre'-এর সমীক্ষায় ৮৭ শতাংশ দেশবাসীর কাছে মোদীর কাজকর্ম উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তাঁরা অনুমোদন নির্দিষ্ট কয়েকটি মাপকাঠির ভিত্তিতে দিয়েছেন যেমন— (১) চাকুরি সৃষ্টি, (২) শৌচালয় নির্মাণ, (৩) সন্ত্রসাবাদের মোকাবিলা, (৪) মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, (৫) গরিবদের যথাযথ প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান। লক্ষ্য করার বিষয়, মোদীর ওপর দেশবাসীর অনুমোদন ২ বছর আগে ওই একই সংস্থার করা সমীক্ষার থেকে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে বললে দাঁড়ায় ভারতে 'গণতন্ত্র বিপন্ন' কথাটি নিছক ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। তাও প্রমাণিতও হয়েছে। হ্যাঁ, একথা সত্যি হতেই পারে যে নরেন্দ্র মোদীই হয়ত ভারতবর্ষের কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে সামান্য যে সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রকরণ-প্রণালীর কারণে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ আটকে যাচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় রাশিয়ার পুতিন, চীনের জি. জিংপিং, এমনকী তুরস্কের তাইপ এরডোগান তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে একনায়কতন্ত্রের লক্ষণগুলি প্রকট করে তুলতেন। নিজেদের কাজও হাতিয়ে নিতেন। বিচার করে দেখলে দেখবেন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সর্বদাই একটি রাজ্যের জনগণের পক্ষে কী মঙ্গলকর হবে তা নির্ধারণ করার ভার সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত করেছে, কখনই প্রধানমন্ত্রীর ওপর নয়।

সত্যিকারের স্বৈরতান্ত্রিক দেশে সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই হোক বা নবীন পট্টনায়ক কিংবা জয়ললিতা এইসব প্রবল দাপটশালী প্রাদেশিক নেত্রী-নেতারা কখনই তাদের জনগণের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার অবস্থায় থাকতেন না। এঁরা কখনই কেন্দ্রের আদেশে পরিচালিত হন না। নিজ ক্ষমতায় চলেন। ঠিক অনেকটা এরকম পদ্ধতিতেই বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ, রাজস্থানে বসুন্ধরা বা ছত্রিশগড়ে রমন সিং স্বাধীন দায়িত্ব পালন করেন। আদতে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্য বরাদ্দের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়ে মোদী সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরও মজবুত করেছেন। তাছাড়া বিশ্বের কোনো স্বৈরতান্ত্রিক নেতাই তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকে বিরোধীদের ইচ্ছায় গুটিয়ে যেতে দেবেন না। কেউ ভাবতে পারেন রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের কোনো পরিকাঠামো উন্নয়ন বা শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে আইন একটু শিথিল করার প্রস্তাব বিশেষ করে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরোধী বাধায় আটকে যাচ্ছে আর তিনি কিছু করতে পাচ্ছেন না। কিংবা চীনের জি. জিংপিং GST (Good & Service Tax) লাগু করতে পারার ক্ষেত্রে বিরোধী বাধায় দীর্ঘ কালক্ষেপে বাধ্য হচ্ছেন। না, এসব সেখানে ভাবা যায় না।

সত্যি বলতে কী আমি একটিও ইংরেজি ভাষার দৈনিকের নাম মনে করতে পারছি না যেখানকার নিয়মিত ভাষ্যকারদের মধ্যে অন্তত কেউ সরকারের দিকে ঝুঁকে কোনো প্রতিবেদন লিখছে। এর মধ্যে অনলাইন প্রকাশনাগুলি আবার একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে সরকার বিরোধিতায় কে কাকে ছাপিয়ে যাবে।

পরিতাপের বিষয়, মোদী সরকার কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে অতি দুর্বল। যেমন সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর বিপুল জনপ্রিয়তাকে মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মাধ্যমেই আরও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে তথ্য-সংস্কৃতিমন্ত্রী সক্রিয়ভাবে মিডিয়ার পরিসরকেই খর্ব করে ফেলছেন। সম্প্রতি কুখ্যাত ৬৬এ ধারার স্বপক্ষে পর্নোসাইট বয়কটে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে মোদী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বারবার ইন্টারনেট স্বাধীনতার কথা বলেছেন তার বিপক্ষে আত্মঘাতী গোল করলেন। একেবারে সদ্য ৯০ দিন ধরে encrypted message না মুছে ফেলার বালখিল্য সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রত্যাহার করতে হলো।

আবার দেখুন বৃহত্তম গণতন্ত্রের গৃহমন্ত্রী সামান্য একটা greenpeace নামের এনজিও'র পরিচালিকাকে প্লেন থেকে নামিয়ে এনে একটা বিরাট খবর করে দেওয়ার সহজ সুযোগ করে দিলেন। এটার উলটো প্রচার হওয়ায় সরকারের বিনা কারণে শুধু বদনামই হলো। তিস্তা শীতলবাদ গুজরাট দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যের নামে যে নিজের এজেন্ডা চালাচ্ছেন তা ফাঁস করতে যখন তখন তল্লাশি কী খুব জরুরি?

শেষে বলতেই হয়, সরকারের কিছু ভুল পদক্ষেপ ছুটকো-ছাটকা বিষয়ে মনোনিবেশ অনেক সময়ই অনভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং তা কখনই দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার কোনো দুরভিসন্ধি নয় (যেমনটা বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে)। সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা হওয়াই দরকার। তবে উলটোপালটা যুক্তিহীন প্রলাপ নয়। 'মোদী মনোবিকার উপসর্গ' (Modi Derangement Syndoame) কিন্তু সুস্থ বিতর্কের রাস্তা অবরুদ্ধ করে দেবে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সংবাদ ভাষ্যকার)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দুর্বলতম অংশকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়েই দেশ উন্নয়নের পথে এগোবে : ভাগবত

“দীনদয়ালজী এক নিরাসক্ত রাজনীতিক ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তবুও তাঁকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল। তিনিও তাঁর অনুপম চিন্তনের দ্বারা ভারতীয় রাজনীতির ধারণাকে আমূল বদলে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এবছর ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষের সূচনা হয়ে গেল। সেই উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত দীনদয়ালজী-র স্বয়ংসেবক ও প্রচারক হিসেবে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং তাঁর অনুপম চিন্তন যা ‘একাত্ম মানবদর্শনের’ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অর্গানাইজারের সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর এবং পাঞ্চজন্য-র সম্পাদক হিতেশ শঙ্করের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলেন।”

□ আপনি কি আজকের দলীয় রাজনীতিতে দীনদয়ালজীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছেন? তাঁর ধ্যানধারণার সঙ্গে বাস্তবে কি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন?

□ এটা দৃশ্যতই পরিষ্কার যে আজকের দিনের রাজনীতির ধরন-ধারণ ও আচরণের সঙ্গে একাত্ম মানবদর্শনের নীতির কোনো মিল নেই। আজকের দিনে রাষ্ট্রের জন্য রাজনীতির ধারণা নেই। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কথা ভেবেও রাজনীতি হয় না। বরং রাজনৈতিক দলগুলিকে কেন্দ্র করেই রাজনীতি হচ্ছে। ‘রাজনীতি’ শব্দটিতে ‘রাজ’ অর্থাৎ ক্ষমতার চিন্তা প্রথমে আসে। তারপর আসে নীতির প্রশ্ন। যখন সবাই এভাবেই ভাবতে শেখে তখন সবকিছুই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ক্ষমতা দখল একটা সহজ কাজ, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নীতিকে কেন্দ্র করে পন্থা নির্ধারণ যথেষ্ট কঠিন কাজ। জনগণ বিভিন্ন দল ও রাজনীতিকদের নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের নিরিখে বিচার করতে শিখেছে, জয়-পরাজয়ের পরে তারা কি করে তা নয়। সমাজেও এই রকমই একটা ভাবনা চালু হয়েছে। নির্বাচনী জয়-পরাজয় একটা তাৎক্ষণিক আবেগের এবং বিভিন্ন বিতর্কিত

বিষয়গুলিকে ভোটের অঙ্কে বদলে দেবার উপর নির্ভর করে। আমি বলছি না যে কোনো দল বা রাজনীতিকরা অথবা সংবিধানের নির্দেশ বা বিধান-এর জন্য দায়ী, কিন্তু এটাই প্রচলিত সুর। এমনকী যদি কোনো দল তার ভাবাদর্শ ও নীতির উপর চলতে চায়, জনগণের ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে তার পরাজয় হয়। রাজনৈতিক পরিণতিবোধের অভাবে দলগুলি ক্ষমতা দখলের জন্য মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করে। এই কারণে রাজনীতি এখন ক্ষমতা দখলের একরকম প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সস্তা এই খেলার— এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজকেই একাজ করতে হবে। যদি ভোটাররা ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ ও জাত-সম্প্রদায়ের স্বার্থ ভুলে বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভোট দিতে পারে তবেই কেবল এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। অনেক সময় দেখা গেছে যে সংকটের মুহূর্তে যখন পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে তখন মানুষ তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের বাইরে বেরিয়ে এসে পরিবর্তনের লক্ষ্যে মতদান করেছে। তবে এটা তাৎক্ষণিক না হয়ে অনেকবেশি স্থায়ী হবার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের ধারাবাহিক ও স্থায়ী রাজনৈতিক পরিণতিবোধই প্রচলতি ব্যবস্থাকে একাত্ম মানবদর্শনের পথে আনতে পারে।

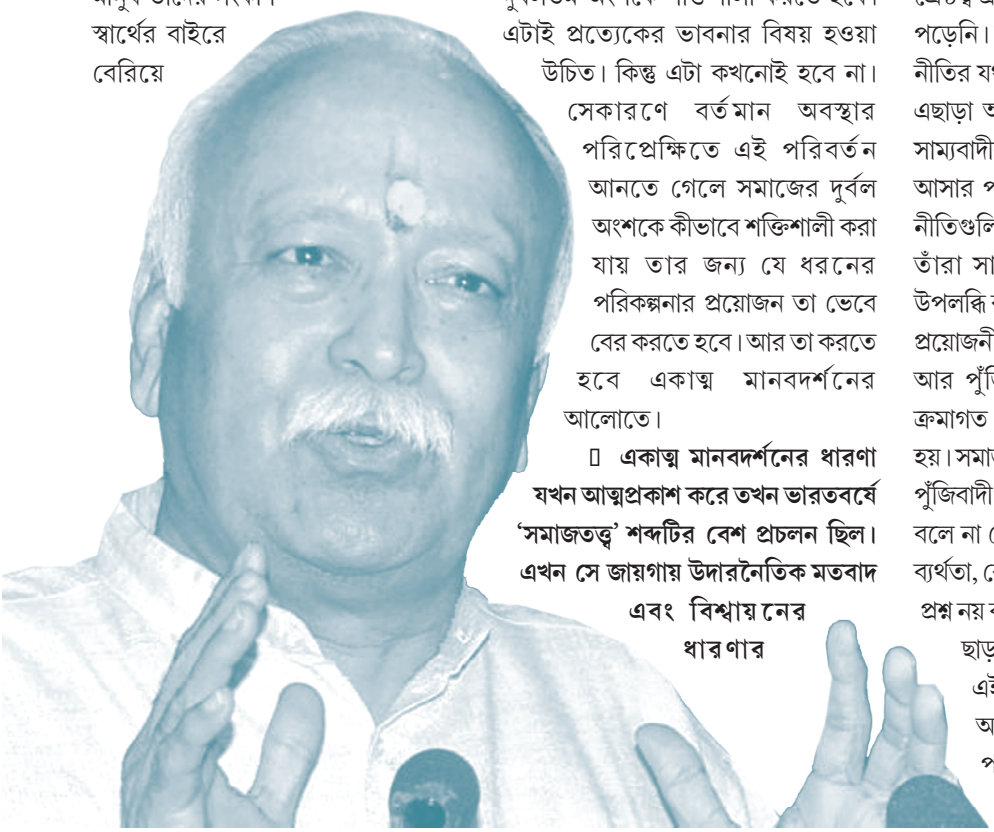

আমরা দীনদয়ালজীর জন্মশতবর্ষ পালন করছি। এই বছরটি আবার তাঁর একাত্ম মানবদর্শন তত্ত্বের আত্মপ্রকাশের সুবর্ণ জয়ন্তী। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর চিন্তনের প্রাসঙ্গিকতা কতদূর রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

নিঃসন্দেহে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একাত্ম মানব- দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা রয়ে গেছে, কেননা এই তত্ত্বের দর্শনগত ভিত্তি শাশ্বত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে অবশ্যই পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে মূলতত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা কী অবস্থায় রয়েছেন তার থেকে বোঝা যায় সমাজ কতটা শক্তিশালী। দুর্বলতম অংশকে শক্তিশালী করতে হবে। এটাই প্রত্যেকের ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু এটা কখনোই হবে না। সেকারণে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন আনতে গেলে সমাজের দুর্বল অংশকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তার জন্য যে ধরনের পরিকল্পনার প্রয়োজন তা ভেবে বের করতে হবে। আর তা করতে হবে একাত্ম মানবদর্শনের আলোতে।

একাত্ম মানবদর্শনের ধারণা যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন ভারতবর্ষে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির বেশ প্রচলন ছিল। এখন সে জায়গায় উদারনৈতিক মতবাদ এবং বিশ্বায়নের ধারণার রমরমা। এই যে পরিস্থিতির এতটা পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একাত্ম মানবদর্শনকে কতটা পুনঃপ্রাসঙ্গিক করা হয়েছে।

কোন্ শব্দ বা কোন্ ধ্যানধারণা সমাজে চালু রয়েছে এটা মূল বিষয় নয়। বরং সততা এবং নীতির বাস্তবায়নের ঐকান্তিকতাই হলো কোনো মতাদর্শের মূল প্রতিপাদ্য। মানবতার পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যেই সমাজবাদ ও উদারবাদ এই দুই তত্ত্বের অবতারণা হয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ১৯১৭ সালে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়। উদারনৈতিক পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। উদারনীতির নাম করে আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর উপর তাদের আধিপত্য কায়েম করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে শুধু স্বার্থ ছাড়া উদারনীতির কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য ছাড়া সেখানে মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই কোনোকালে চোখে পড়েনি। কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই কোনো নীতির যর্থার্থতা প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কাল যদি সাম্যবাদীরা ক্ষমতায় আসেন আর ক্ষমতায় আসার পর অকৃত্রিমভাবে সাম্যবাদের মূল নীতিগুলি অনুসরণ করেন, তবে সম্ভবত তাঁরা সাম্যবাদী ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করবেন। এবং সেই অনুসারে তাঁরা প্রয়োজনীয় সংশোধনও করবেন। সমাজবাদ আর পুঁজিবাদ উভয়েই নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ক্ষণস্থায়ী হয়। সমাজবাদী হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী, আবার পুঁজিবাদী হয়ে যায় সমাজবাদী। কিন্তু কেউই বলে না যে এটাই সমাজবাদ বা পুঁজিবাদের ব্যর্থতা, কেননা তাঁদের কাছে এটা মতাদর্শের প্রশ্ন নয় বরং শুধুই ক্ষমতা আর সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষে আমরা এই আদর্শগত অবস্থানের বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারছি কি না, আমাদের ভাবাদর্শের নীতির প্রতি সৎ থাকছি কিনা এবং

সেইমত কাজ করার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অনুসরণ করছি কিনা সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এখানে কিন্তু একাত্ম মানবদর্শন আমাদের পথ দেখায়।

□ দীনদয়ালজীর দর্শনের মূল ভিত্তি হলো 'রাষ্ট্রের জন্য রাজনীতি'। এখন দেশে প্রভূত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মানুষের অনেক চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। এটাকে কি আপনি বিভাজন আর তোষণ রাজনীতির পরিণতি হিসেবে দেখেন? একে কি আপনি নতুন যুগের সূচনা হিসেবে দেখেন?

□ আমি মনে করি যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এনিয়ে আলোকপাত করেছি। তাদের তো এটা করতেই হবে। কিন্তু শুধুমাত্র তাদের এই চেতনার পরিবর্তন সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে পারবে না। কেবল যদি একটি দল এই কাজটা করতে চেষ্টা করে তবে তারা কতদূর তা করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যদি তোষণের রাজনীতিকেই অনুসরণ করা হয়, তবে কতদূর সেটা করা যাবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। এর জন্য সমাজ সচেতনতাও জরুরি। জনগণ যে সরকারকে চায়, শেষ পর্যন্ত তারা সেই সরকারকেই পায়। সমাজের মরা-বাঁচা রাষ্ট্রের জন্য কিনা সেটাই আসলে আমাদের ভাববার বিষয়। রাজনীতিকদের তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু সমাজকে এজন্য তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এরা উভয়েই হাত ধরাধরি করে চলবে। যতক্ষণ দারিদ্র্য আছে ততক্ষণ 'গরিবি হঠাও' শ্লোগান কাজ করবে। কিন্তু একবার দারিদ্র্য দূর হয়ে গেলে, লোকেরা শিক্ষিত হয়ে গেলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নিত্যনতুন দাবি ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তাঁরা এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইবেন না। এরকম প্ররোচনায় পা দেওয়া থেকে রাজনীতিকদের সতর্ক থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রয়াস চালাতে হবে।

□ একাত্ম মানবদর্শনকে কাজে প্রয়োগ করার জন্য বাস্তবধর্মী কি হতে পারে?

□ আমরা যখনই কোনো মতাদর্শ বা দর্শন নিয়ে ভাবি, তখন কিন্তু তাকে শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কথা ভাবি না। বরং আমরা তাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিতে চাই। জ্ঞানেশ্বরের মতো সন্তরাও বলে গেছেন যে সমগ্র বিশ্বে ধর্ম জাগরণের কথা চিন্তা করতে হবে। 'সমগ্র বিশ্বকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা'-র প্রস্তাব ডাঃ হেডগেওয়ারও কংগ্রেস অধিবেশনের পেশ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তা গৃহীত হয়নি। সকলের মঙ্গল সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের লক্ষ্য হওয়ায় উচিত। ভারতের অন্তর্নিহিত প্রকৃত শক্তিকে উপলব্ধি করার জন্য একাত্ম মানবদর্শন একটি বিশেষ চিন্তাধারা। সামগ্রিকভাবে বিশ্বে প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলো শোষণ ও দমনমূলক। ধর্মের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত একাত্ম মানবদর্শনের মাধ্যমে দীনদয়ালজী সমস্ত মতাদর্শের বিকল্প একটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত আমরা শুধুই বিজাতীয়

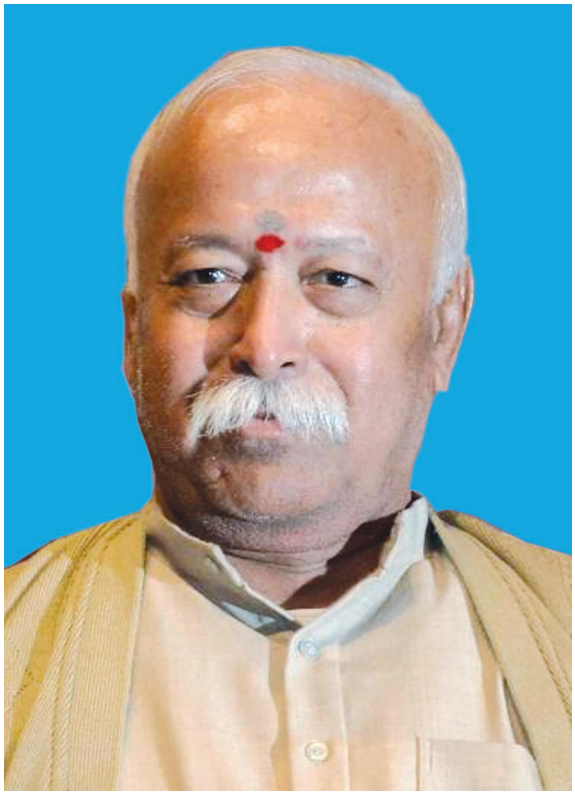

> "আমাদের সচেতনতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে যে জাতীয় স্বার্থের মধ্যেই আমার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সরকারকেও যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে যাতে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিদ্রোহ-আন্দোলন না হয়। একাত্ম মানবদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে যে জনগণ আর সরকার আলাদা।"

ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আর আজকের দিনে এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসব মতাদর্শকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে আমাদের উচিত তাদের ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করা। সেসবের সঙ্গে ভারতের মাটি থেকে উপাদান নিয়ে আমাদের একটি নতুন আদর্শ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় এই লক্ষ্যে কিছু প্রয়াস চলছে। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ আর শান্তির জন্য যে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণ প্রয়োজন। সেটাই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়। এটা অনুধাবন করেই আজ আমাদের প্রাসঙ্গিক নীতির অনুসন্ধান ও চর্চা প্রয়োজন।

▯ ভারতবর্ষকে প্রাথমিকভাবে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে ভাবা হলেও এখানে কৃষকদের হাল প্রকৃতই করুণ। কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য দীনদয়ালজীর দার্শনিক দিগদর্শনের মধ্যে কীভাবে পথ খুঁজে পাব?

▯ কৃষি, বনভূমি-সহ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সহজাত সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত হয়েছে আমাদের সমৃদ্ধ জীবনমূল্য ও সংস্কৃতি। প্রকৃতিকে আমরা মনুষ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি। পৃথিবীতে মানুষ ও প্রকৃতি একটি অভিন্ন সত্তা হিসেবেই সহাবস্থান করছে। ভারতবর্ষ এখনও প্রাথমিকভাবে একটি কৃষিজীবী দেশ। ভারতীয় জীবনধারা ও কল্যাণের যথার্থ ধারক ও বাহক হলো কৃষক ও বনবাসীরা। সমস্ত নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার তাঁদের কথা মাথায় রেখেই করা উচিত। এটা করতে যাবার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে শিক্ষা যেন আমাদের প্রচলিত জ্ঞানবুদ্ধির ধ্যানধারণার অনুসারী হয়। বৃটিশ শাসনেরও ২০০ বছর আগে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে আমরা অগ্রণী ছিলাম। অনেক গবেষক তথ্য সহযোগে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমরা হাজার বছর ধরে উৎপাদনের এই দুই দিকের মধ্যে সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারপর বৃটিশরা যখন আমাদের এই পরম্পরাকে ধ্বংস করল, তখন থেকে আমরা কৃষি ও শিল্পকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শুরু করলাম। আমরা ভাবলাম যে কৃষি ও শিল্প একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরোধী। এটা একটা মার্কামারা পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের কৃষি অথবা শিল্পের তকমা বয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের দুটোরই দরকার। সমস্ত নীতিগুলি এরকম হওয়া উচিত যাতে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র কৃষকটিও দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পায়। এমনকী ভূমিহীন কৃষকও যেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য না হয়। একই সঙ্গে যাতে আমরা বিশ্বে আমাদের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে পারি তার জন্য শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে হবে। দীনদয়ালজী বলেছিলেন যে বনসম্পদকে ধ্বংস না করে এবং অনুর্বর জমিকে সর্বাধিক ব্যবহার করে আমাদের প্রয়োজনীয় শিল্পায়ন করতে হবে। আমাদের চাহিদা মেটাতে এবং কিছু খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করার জন্য কতটা কৃষিজমির প্রয়োজন তা আমাদের নিরূপণ করতে হবে।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কতটা বনাঞ্চল রক্ষা করার প্রয়োজন তাও আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। তখন কতটা জমি শিল্পের জন্য আমরা বরাদ্দ করব তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে পূর্বতন সরসঙ্ঘচালক স্বর্গীয় সুদর্শনজী ঝাড়খণ্ডে একটি নমুনা গবেষণা চালিয়েছিলেন। সেখানে একদল জনজাতিদের ডেকে তিনি একটা ছোট উনুনের মতো পাত্রের সাহায্যে লোহা তৈরির কৌশল দেখিয়েছিলেন। এই সব উদাহরণকে সামনে রেখে আমাদের নতুন পথের সন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। আমেরিকা এবং ইউরোপের পরিস্থিতি আলাদা। সে কারণে তাদের পরিকল্পনা পদ্ধতিও আলাদা। সেগুলি একইভাবে সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। তাদের যা যা ভালো আছে তা আমরা অবশ্যই শিখব, কিন্তু প্রাথমিক ভাবে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি ও প্রযুক্তি তৈরি করতে হবে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের নিজস্ব জ্ঞান, প্রযুক্তি আর পরম্পরার সংমিশ্রণে আমরা এরকম একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি যা সবার সুখ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

▯ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শেখানো হয় যে সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন গণতন্ত্রকে টগবগে করে তোলে। পণ্ডিতজী বিশ্বাস করতেন যে আমাদের পরস্পরের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সামনে এগনো উচিত। 'এক পদ এক পেনশনের' দাবিতে আন্দোলন বা সংরক্ষণের দাবিকে আপনি একাত্ম মানবদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে দেখেন?

▯ আমি মনে করি না যে একাত্ম মানবদর্শন সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে। সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে ওঠে কারণ গণতন্ত্রে আমাদের কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে। একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে আমরা অপরের স্বার্থের বিনিময়ে এমন কিছু আশাপূরণের দাবি করতে পারি না। সকলের কল্যাণের জন্য আমাদের একটা একাত্ম দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। আমাদের সচেতনতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে যে জাতীয় স্বার্থের মধ্যেই আমার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সরকারকেও যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে যাতে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিদ্রোহ-আন্দোলন না হয়। একাত্ম মানবদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে যে জনগণ আর সরকার আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি চান পাখা খুব জোরে চলুক যেটা আমি একেবারেই চাই না। তথাপি আমরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে পাখার গতি কমাতে পারি। এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে আমরা পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি। সংঘর্ষের মাধ্যমে নয়, সমন্বয় বিধানের মধ্যে দিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে পারি। সরকার এবং সমাজ উভয়কেই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে সমষ্টির স্বার্থের মধ্যেই আমার স্বার্থ রয়েছে। উভয় দিকের মধ্যে এই ভারসাম্য থাকতে হবে। বস্তুত তারা আলাদা দুটি পক্ষ নয়, বরং অখণ্ড সমগ্রেরই অংশ বিশেষ। সকলকেই একথা বুঝতে হবে যে একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীকে দমন-পীড়ন করলে তা আমাদের সামগ্রিক স্বার্থেরই পরিপন্থী হবে। এইরকম বদ্ধমূল সংস্কার

আমাদের মনের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

□ ব্যাপারটা একটু পরস্পর বিরোধী ঠেকছে। একদিকে আপনি বলছেন যে সমাজ ততটা পরিণত হয়নি, আবার একইসঙ্গে আশা করছেন যে সমাজের দুর্বলতম অংশ এই রূপান্তরের ভূমিকা পালন করবে। আপনি মনে করেন না যে এটা যতটা তাত্ত্বিক ততটা বাস্তবসম্মত নয়?

□ বিষয়টা অবাস্তব এবং অসম্ভব মনে হতে পারে কিন্তু সামনে এগিয়ে যাবার জন্য এটাই একমাত্র পথ। এর কোনো বিকল্প নেই। সরকারকে কার্যকরী নীতি প্রণয়ন করতে হবে, আর সমাজকে একাত্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এভাবে পরস্পরের পরিপূরক পদ্ধতিকে পাশাপাশি চলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে সংকল্প নিতে হবে যে 'হ্যাঁ, আমরা এটা করতে পারি'। আমরা এই চেষ্টাটা করিনি বলেই সিদ্ধিলাভ করিনি। যদি সমাজের এবং রাজনীতি জগতের উপরতলার লোকেরা এটা স্বীকার করে নেয় এবং এক লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায় তবে আমরা এটা অর্জন করতে পারি। অনেক সময়েই আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হবে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পথসঞ্চলনের কার্যক্রম নেই তখন এমন অনেক পরিস্থিতি আসে যেখানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না। তখন বিকল্প যাত্রাপথের অনুসন্ধান করে আমরা পথসঞ্চলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই। শেষে ঘুরপথে আবার আমরা গন্তব্য যাত্রাপথে ফিরে আসি। এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ কিন্তু এটাই সঠিক উদাহরণ, কারণ এর মধ্যেই সঠিক মনোভাব প্রকাশ পায়। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন এবং যাঁরা সমাজের জন্য কাজ করেন তাঁরা উভয়ে মিলে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে পারেন যেটা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে সম্ভব হয় না। একাত্ম মানবদর্শন হলো বাস্তবতম দৃষ্টিভঙ্গি। এই দর্শনকে বুঝতে গেলে আমাদেরকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে কয়েককদম চলতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটি প্রয়োগ বা প্রদর্শন না করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর বাস্তবতাকে প্রমাণ করতে পারব না।

□ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে অনেক টানাপোড়েন রয়েছে; কখনও 'স্পেশাল প্যাকেজে'র নাম করে তো কখনও সমতার প্রশ্নে। একাত্ম মানবদর্শনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে আমরা এর সমাধানসূত্র বের করব?

□ আবেগপূর্ণ সহৃদয়তাই এর একমাত্র সমাধানের রাস্তা। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই রাষ্ট্রের জন্য সরকার চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রগুলি অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমাহার, তারা পৃথক নয়। যেমন হাত, পা বা মস্তিষ্ক দাবি করতে পারে না যে তারা স্বতন্ত্র; তেমনি রাজ্যগুলিও রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতক্ষণ এই বন্ধনটা অটুট থাকবে, ততক্ষণ সবকিছু ঠিকঠাক চলবে। একবার 'স্পেশাল প্যাকেজ' রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে গেলে এবং অন্য সব সংগঠনগুলি তা দেখে যদি মনে করতে শুরু করে যে রাজনৈতিকভাবে কৌশলে চাপ দিয়ে সুযোগ নিতে পারলে তারা এগিয়ে যাবে, তখনই শুরু হয়ে যায় অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। একটা সুন্দর সম্পর্কে তৈরি করার জন্য আমাদের যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করে সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

□ আপনি বলছেন যে সততা আর নিষ্ঠা হলো আসল মাপকাঠি। একাত্ম মানবদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো কর্মপন্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা প্রস্তাবিত হয়েছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে পান কি?

□ বাণিজ্যিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংবিধান প্রণেতারা ভেবেচিন্তে যে পন্থা নিয়েছিলেন তা নিয়ে রাজনীতি না করে আমরা যদি সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতাম তবে আজকের এই অবস্থা তৈরি হোত না। শুরু থেকেই এটা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। আমরা মনে করি— যে সমস্ত লোকেরা প্রকৃতই সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে ভাবেন এবং সামাজিক সমতা বিধান করতে বদ্ধপরিকর তাঁদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হোক যার মধ্যে সমাজের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। তাঁদেরই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে কোন শ্রেণীর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তা কতদিন পর্যন্ত। স্বশাসিত আয়োগের মতো অরাজনৈতিক সমিতিগুলিকে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতা দেওয়া হোক। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ শুধু তাঁদের সততা আর নিষ্ঠার তত্ত্বাবধান করবে।

□ একাত্ম মানবদর্শন শিক্ষা ও শিক্ষা-নীতিকে নিয়োগ যোগ্যতা এবং সংস্কারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আপনি কি কিছু উপায় বলে দিতে পারেন?

□ প্রথমত, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণার সংস্কার প্রয়োজন। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একথা মানে যে শিক্ষাকে নিয়োগযোগ্য হওয়া উচিত। একইসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভালো মানুষ তৈরি করা। স্বাধীনতার পর আমরা নিজেদের মূল্যবোধ নির্ভর একটা আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির কথা কখনও ভাবিনি। এ ব্যাপারে ন্যূনতম যে সব অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে সেসব কাজে প্রয়োগ করা হয়নি। একাত্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিস্থিতি ও অভিমুখকে আপাদমস্তক বদলে দেওয়া প্রয়োজন। প্রেরণাদায়ী ভালো শিক্ষক তৈরিই শিক্ষানীতির মূল আগ্রহের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি একেবারে কমে যাবে। শিক্ষা হবে সততার উপর প্রতিষ্ঠিত যা দেশের নাগরিকদের মনোবল বাড়াবে। শিক্ষা আমাদেরকে ভালো মানুষ করে গড়ে তুলবে। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষাকে আটকে রাখার কথা বলছি না। পরিবার এবং সমাজের মধ্যে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ থাকার প্রয়োজন। দীনদয়ালজী সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলতেন। আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার ও পাঞ্চজন্য)

অনুবাদক : দিব্যজোতি চৌধুরী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

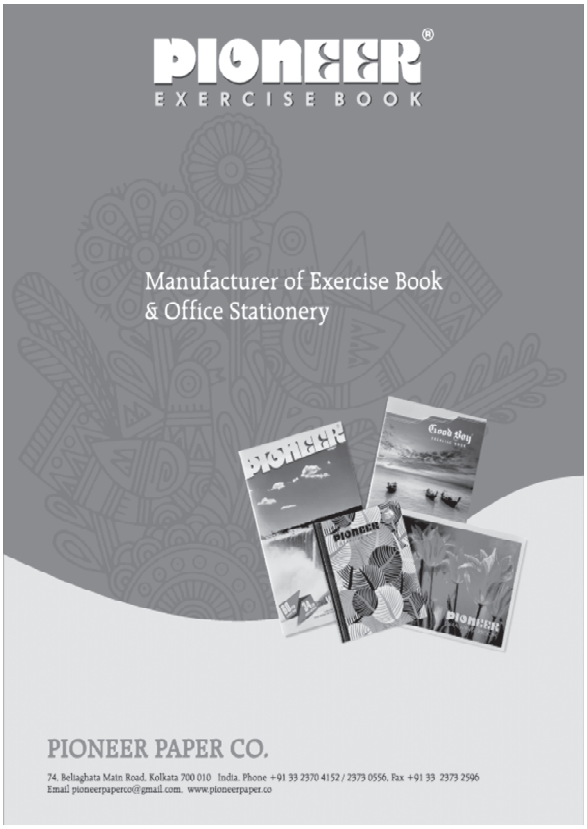

'হিন্দুর চিন্তাধারায় ঈশ্বরের ভালবাসা একমাত্র মাতার ভালবাসার সঙ্গে তুলনীয়। স্বামীর মধুর ব্যবহার অনুযায়ী পত্নীর প্রেমের তারতম্য ঘটে, মাতৃস্নেহ পত্নীর প্রেমকে স্বভাবতই অতিক্রম করে যায় এবং সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই স্নেহ গভীরতর হয়ে অবশেষে প্রিয়জনকে নরকেও অনুসরণ করে। মাতৃস্নেহ বলতে বোঝায় সেই আকুল ভালবাসা, যা কোনো দিন আমাদের প্রত্যাখ্যান করে না, যা চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকে আশীর্বাদরূপে, যার সান্নিধ্য আমরা কদাচ অতিক্রম করতে পারি।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

হঠাৎ গলার স্বর ভাঙা এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (এম.ডি হোমিও)

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ তার মন এবং কথা বলার শক্তি আছে। যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন তিনি প্রকৃত মানুষ। কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ কারও গলার স্বর ভেঙে যায়। তখন মনে ভয় জাগে ক্যান্সার নয়তো? কারণ স্বর ভেঙে যাওয়া ক্যানসার রোগের একটি উপসর্গ। প্রাথমিক অবস্থায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই রোগ সেরে যায়।

এখন দেখা যাক মানুষের স্বর তৈরিতে কোন কোন অঙ্গের ভূমিকা আছে। আমাদের স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স গলার মধ্যে অবস্থিত খুব ছোট, মাত্র চার থেকে সাড়ে চার সেন্টিমিটারের মতো দীর্ঘ। বিভিন্ন কার্টিলেজ বা তরুণাস্থির সমন্বয়ে এই ল্যারিংক্স গঠিত। এর উপরের দিকে দুটো ভোকাল কর্ড থাকে যা স্বর সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

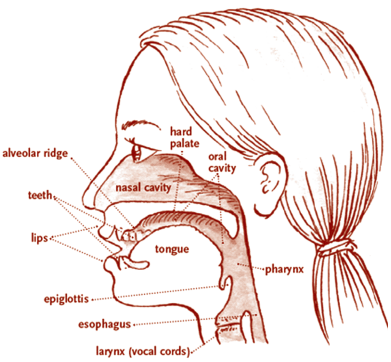

বুক ও পেটের মাংসপেশির সঙ্কোচনের ফলে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু স্বরযন্ত্রের দুদিকের দুটো বন্ধ ভোকাল কর্ড দুটোকে খুলে দেয় ও বায়ু অল্প অল্প করে পাফ-এর মতো করে বেরোতে থাকে। এই পাফগুলো ভোকাল কর্ডের বিভিন্ন অংশে কম্পনের সৃষ্টি করে শব্দ তৈরি করে। মুখগহ্বর, গলবিল, নাক ও বুক এই শব্দের প্রাবল্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। শব্দ ঠোঁট, জিভ, তালু, গলবিল ও দাঁতের মাধ্যমে মডিউলেটেড অর্থাৎ পরিশীলিত হয়ে স্বর বা কথায় পরিণত হয়। শব্দের তীব্রতা বা প্রাবল্য নির্ভর করে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু কতটা জোরে বেরুচ্ছে তার উপর। আর এর তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে ভোকাল কর্ডের কম্পাঙ্কের উপরে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ভোকাল কর্ড প্রতি সেকেন্ডে সাধারণত গড়পড়তা একশো বার কাঁপে। মহিলাদের ক্ষেত্রে গড়পড়তা কাঁপে দুশো বার। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ভোকাল কর্ডের কম্পাঙ্ক আলাদা হয়। স্বর ভাঙার জন্য সাধারণভাবে দায়ী অসুখগুলো হলো— ল্যারিনজাইটিস বা স্বরযন্ত্রের প্রদাহ। সাধারণত ঠাণ্ডা অর্থাৎ ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া- জনিত জীবাণুর আক্রমণ স্বরযন্ত্রে প্রদাহ হয়ে গলার স্বর বসে যেতে পারে। সঙ্গে জ্বর, গলাব্যথা, কাশি, এমনকী শ্বাসকষ্ট এসবও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ঠিকঠাক চিকিৎসা না হলে অসুখের বাড়াবাড়ি হতে পারে। অতিরিক্ত কথা বললে বা গান করলে তা পরবর্তীতে গলার স্বরের দীর্ঘমেয়াদি বিকৃতি ঘটতে পারে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে ও আর্দ্র পরিবেশে থাকতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে। কখনো কখনো স্বরযন্ত্রের তীব্র বা স্বল্পমেয়াদি প্রদাহ ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদিভাবে চলতে থাকে। সাইনাস, দাঁত, টনসিল, ফুসফুসের পুরনো অসুখ, দূষিত কলকারখানার কাজ, ধূমপান, মদ্যপান, তামাকজাতীয় এবং নানা মাদকদ্রব্য সেবন। স্বরের অতিরিক্ত ও বিকৃত ব্যবহার এই দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহের জন্য দায়ী হতে পারে। স্বরযন্ত্রের টিউবারকিউলোসিস রোগেও গলার স্বর বসে যেতে পারে। সেই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে।

ভোকাল কর্ডের বিভিন্ন অসুখ এবং টিউমার : স্বরের অতিরিক্ত ব্যবহার, বিকৃত ব্যবহার, ধূমপান এসব কারণেই সাধারণত ভোকাল কর্ডের বিভিন্ন অসুখ হয়ে থাকে। ভোকাল নডিউল বা সিঙ্গারস নডিউল এই অসুখটি মূলত শিক্ষক, গায়ক, অভিনেতা, আবৃত্তিকার, হকার, নিলাম, শেয়ারবাজারের কর্মী, যাদের জোরে কথা বলতে হয় তাদের হয়। ভোকাল কর্ডের সামনের এক তৃতীয়াংশ ও পেছনের দুই তৃতীয়াংশের সংযোগস্থলটি কথা বলার সময় সবচেয়ে বেশি কম্পিত হয়। এই অংশটি সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীলও। এই অসুখে আলপিনের মাথার থেকেও অনেক ছোট মটরদানার সাইজের দুটো গুটি সাধারণত দু'দিকের ভোকাল কর্ডে দেখা যায়। হোমিওপ্যাথি লাক্ষণিক চিকিৎসা, তাই লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগ করলে স্বরযন্ত্রের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সচরাচর ব্যবহৃত ওষুধগুলি হলো—

গলায় ছুঁচ ফোটার ন্যায় বেদনা, নিশ্বাস ফেলতে বড়ই কষ্ট, গরম ঘরে ও নিদ্রান্তে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি এক্ষেত্রে—**এপিস।**

বক্তাদের, সঙ্গীত শিল্পীদের স্বরভঙ্গ— **আর্জেন্টাম নাইটিকাম।** **অরামট্রিফিলিয়াম**— নানা প্রকারের স্বর, গলাব্যথা এবং স্বরভঙ্গ। **কষ্টিকাম**— গলা সুড়সুড় করে কাশি, সালফারের স্বরভঙ্গ, সকালে বৃদ্ধি। **কার্বোভেজ**— স্বরভঙ্গ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। **ড্রসেরা**— হুপিংকাশি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বৃদ্ধি। **হিপারসালফার**— শেষ রাত্রের দিকে শুষ্ক কাশির সঙ্গে স্বরভঙ্গ, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট কমে আসে। **ফসফরাস**— কাশির সঙ্গে স্বরভঙ্গ। **রাসটক্স**— জলে ভিজে বা জলে কাজ করারপর কিছু হলে এই ওষুধ বিশেষ কার্যকরী। **স্পাঞ্জিয়া**— কাশি, করাত টানার মতো শব্দ। **স্ট্যানাম**— মিষ্ট স্বাদ যুক্ত ভেলা চেলা সাদা রঙের শ্লেষ্মা যুক্ত কাশি।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

‘শ্রদ্ধা’র ৬৭তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১২ সেপ্টেম্বর, ‘শ্রদ্ধা’ তার ৬৭ তম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিউড়ির সুধাকৃষ্ণ রায়কে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন প্রবীণ শিক্ষক শান্তি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়; তিনি শ্রী রায়ের সুযোগ্য ছাত্র। পার্থবাবুর কাছ থেকে তাঁর শিক্ষকতা সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে ‘শ্রদ্ধা’-র যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে নানা গান, কবিতা পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ‘শ্রদ্ধা’-র কর্ণধার লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ, প্রান্তের পরীক্ষা প্রমুখ নির্ভয়কান্তি ঘোষ, বিদ্যাভারতীর ক্ষেত্রীয় সঙ্গীত প্রমুখ বিমলকৃষ্ণ দাস এবং প্রান্তের সঙ্গীত প্রমুখ অপূর্ব অধিকারী। উত্তরবঙ্গের ২৬টি বিদ্যালয় থেকে ৪৭ জন ভাই-বোন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগীরা পুঞ্জ প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার পর প্রান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পেরেছে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী জীবন মহারাজ, যিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী। ছিলেন বাংলাদেশের কুমিল্যায় অবস্থিত কাজি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুবীর চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী নন্দিনী ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সহ-সঙ্গীত প্রমুখ বরুণাদিত্য দাস, শিশুতীর্থের প্রাক্তন অভিভাবক শিক্ষক গোপাল দত্ত প্রমুখ। প্রতিযোগিতার পর রামকৃষ্ণ মিশনের জীবন মহারাজ সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অনুভূতির কথা বর্ণনা করেন। ২০ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

ক-বিভাগে (৩য়+৪র্থ)

প্রথম হয় উদিতা ঝা—সারদা শিশুতীর্থ রায়গঞ্জ। দ্বিতীয় দিশাহোড় মজুমদার—সারদা শিশুতীর্থ দিনহাটা। তৃতীয় কৃষ্ণা দাস—সারদা শিশুতীর্থ সূর্যসেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

খ-বিভাগে (৫ম+ষষ্ঠ)

প্রথম—প্রত্যুষা সরকার—সারদা শিশুতীর্থ নকশালবাড়ি। দ্বিতীয়— অরিত্বা নন্দী—সারদা শিশুতীর্থ নকশালবাড়ি। তৃতীয়— তানিয়া মজুমদার—সারদা শিশুতীর্থ ধূপগুড়ি।

গ-বিভাগ

প্রথম— সংলাপ দে—সারদা শিশুতীর্থ রায়গঞ্জ। দ্বিতীয়— স্নেহা বর্মন—সারদা শিশুতীর্থ পুটিমারি। তৃতীয়— সাগরিকা দত্ত—সারদা শিশুতীর্থ, রায়গঞ্জ। এদিন বিকেল পাঁচটায় শুরু হয় শিশু বিচিত্রা অনুষ্ঠান। শিশুদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক জগদীশ রায়। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণী, শিলিগুড়ি সহ-অধিকর্তা সঞ্জীব গাইন। অনুষ্ঠানে হারমোনিয়ামে ছিলেন অপূর্ব অধিকারী, তবলায় ছিলেন বরুণাদিত্য দাস, পার্কাসনে পরেশ চন্দ্র সরকার।

পূর্বস্থলীতে শ্রীবলরাম পূজা

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ বর্ধমানের পূর্বস্থলী খণ্ডের উদ্যোগে কালিকাতলা বাজারে কৃষি দেবতা ভগবান বলরামের পূজার আয়োজন করা হয়। দুপুরে হরিনাম সংকীর্তন এবং সন্ধ্যায় লোকগীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা অরুণ দাস, শচীন্দ্র কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া সহ-জেলা প্রচারক বিশ্বজিৎ দাস উপস্থিত ছিলেন।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সংস্কার ভারতীর গৌড়ীয় নৃত্য কর্মশালা

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ শাখা আয়োজিত গৌড়ীয় নৃত্যের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবনে। কর্মশালা পরিচালনা করলেন গৌড়ীয় নৃত্য সাধিকা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। ৭টি স্থান থেকে ১৬ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দু'দিন ব্যাপী কর্মশালায় গৌড়ীয় নৃত্যের বিভিন্ন স্তর তাৎপর্যসহ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সহকারী হিসাবে তিনজন ছাত্রছাত্রী যথাক্রমে সৌম্য ভৌমিক, বাসন্তী মজুমদার, রক্তিমা চ্যাটার্জি নৃত্যের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করেন।

প্রণাম, অঙ্গসাধনা, পাদভেদ, স্থানক (দাঁড়ানোর ভঙ্গি), হস্তক, উপবিষ্ট, উৎপ্লাবন, অলপ, ভ্রমরী, নৃত্যাঙ্গ, নৃত্ত (তাল-সহ নাচ), নৃত্য (তাল-সহ আবেগ প্রকাশ), নাট্য (কাহিনি প্রকাশ), চারী ইত্যাদি গৌড়ীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশিক্ষণ লাভ করেন অংশগ্রহণকারীরা।

ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ব্যাখ্যা-সহ দৃশ্য-শ্রাব্য অংশটি প্রশিক্ষণ পর্বে বিশেষ মনোগ্রাহী হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন মন্দির গাত্রে খোদিত নটরাজ মূর্তির ভঙ্গিমা তিনি বিশ্লেষণ করেন দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি তপন গাঙ্গুলী এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-সহ প্রান্তের বিশিষ্ট অধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার শেষ পর্বে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রশস্তিপত্র প্রদান করেন ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের কার্যকরী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন— দু'মাস অন্তর ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন ও সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য শিল্পীরা গৌড়ীয় নৃত্যকেন্দ্রিক একটি নৃত্যালেখ্য মঞ্চ উপস্থাপনা করবেন।

উত্তরপাড়া সংস্কার ভারতীর জন্মাষ্টমী উদযাপন

গত ৬ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয় স্বামী নিঃস্বস্বলানন্দ গার্লস কলেজের ধর্মচক্র কক্ষে। সন্ধ্যায় সমবেত ভাবসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুবীর মল্লিক। শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিজয়কুমার চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানে 'অভিনব কৃষ্ণসাজো প্রদর্শন'-এ ২ থেকে ১০ বছরের শিশুরা শিল্পকলার মাধ্যমে প্রদর্শন করে কৃষ্ণের বিভিন্ন বাল্যলীলা। এই অভিনব প্রদর্শন দেখে সভাকক্ষ করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। পরে সমবেত এবং একক নৃত্য প্রদর্শন করে শাখার শিশুশিল্পীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রীতা দাস। সবশেষে প্রদর্শনকারী সকল শিশুশিল্পীদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেন শাখার সভাপতি বিজয় চক্রবর্তী এবং সহ-সভানেত্রী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শাখার সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

কলকাতায় ডাঃ হেডগেওয়ার ব্যাখ্যানমালা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে চতুর্থ ব্যাখ্যানমালার আয়োজন করা হয় মহাজাতি সদনের পার্শ্ব সভাকক্ষে। সভাপতিরূপে অসম ও নাগাপ্রদেশের রাজ্যপাল পদ্মনাভ আচার্য এবং প্রধান বক্তারূপে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর জাজু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস, মোহনলাল পারীক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাবীর বাজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

এবিভিপি-র কলকাতা সমিতি

গত ৩০ আগস্ট কলকাতার নরেশ ভবনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা মহানগর কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি— রমাজ্যোতি সরকার, সহ-সভাপতি— অমিত সামন্ত, ড. ইন্দ্রনীল খাঁ, প্রিয়ম ঘোষ। সম্পাদক— প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। কার্যালয় সম্পাদক— দিব্যেন্দু ঘোষ। সদস্য— বিবেক বিশ্বাস ও অরিজিৎ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরি বরিকর, রাজ্য-সভাপতি ড. রমণ কুমার ত্রিবেদী এবং কলকাতা মহানগর বিস্তারক বিশ্বজিৎ শীল।

দীনদয়ালজীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর মালদার কাঞ্চনতারে অরবিন্দ যোগ মন্দির লাইব্রেরি ও ক্লাবের পক্ষে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। নেহরু যুব কেন্দ্রের সহায়তায় হওয়া এই অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি রঘুনাথ দাস এবং সম্পাদক তরুণ কুমার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনী বর্ণনা করেন। কাবাডি এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব সংস্কৃত দিবস পালন

গত ২৪ সেপ্টেম্বর মালদহে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব সংস্কৃত দিবস পালন করে। বেদ পাঠের মাধ্যমে সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক মৃণাল চন্দ্র দাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা চন্দন, উত্তরীয় এবং ফুলের স্তবক দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেন। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র, রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপ কুমার মজুমদার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিকাশ রায়, সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক সমীরণ মাঝি প্রমুখ। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অমিত মণ্ডল। তিনি গত আগস্ট মাসে কলকাতা এবং দিল্লী-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন সংস্কৃত দিবস

পালনের কথা বলেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত ভাষার সংরক্ষণের কথা বলেন।

স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ জাতীয় ঐক্যের ও মূল্যবোধের বাহক হিসাবে সংস্কৃতমনস্ক মানুষের সংস্কৃত চর্চার প্রসঙ্গে বলেন সংস্কৃত এবং ভারতীয় সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। সারা পৃথিবীতে যোগ এবং ধর্ম এখন জনপ্রিয় হচ্ছে এবং তা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সংস্কৃতভারতীর উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক সমীরণ মাঝি বলেন, ৩৬৫ দিনই সংস্কৃত দিবস হওয়া উচিত।

অনেক বছর আগেই তিনি কলকাতা ছেড়ে বেঙ্গালুরু নিবাসী। বছরে একবার অন্তত সম্ভব হলে কলকাতার সল্টলেকে আসেন দাদু-দিদার বাড়ি। অনির্বাণ লাহিড়ি বিশ্বের অন্যতম অভিজাত এবং শিল্পপ্রসারী খেলা গলফের সর্বোচ্চ মঞ্চে গর্বিত পদচারণা করলেও সল্টলেকের টান ভুলতে পারেন না। সম্প্রতি জীবনের সেরা পারফরমেন্স করে কলকাতায় এসেছিলেন

গলফের বিশ্বদরবারে অনির্বাণ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টিভি চ্যানেলের বিশেষ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। সে উপলক্ষে দু'দিন সল্টলেকের দাদু-দিদার বাড়িতে কাটিয়েও গেলেন। এর মধ্যে সময় বের করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। সেই কথায় উঠে এসেছে আগামী রিও অলিম্পিককে ঘিরে তার স্বপ্নের সালতামামি। অনির্বাণ জানিয়েছেন যতই এশিয়া সেরা গলফার হোন এবং এশিয়ান ও ইউরোপিয়ান 'অর্ডার অব মেরিট' খেতাব তাঁর বাড়ির শোকেসে শোভা পাক। ওই একটা অলিম্পিক পদকই তাকে বিশ্বনায়কের আসনে বসিয়ে দেবে। দেশের জন্য সব সেরা সম্মান, মর্যাদার মহার্ঘ্য অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য ক'দিনের ছুটি কাটিয়ে ফের সার্কিটে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন। গলফ এবারই প্রথম অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দুনিয়ার সেরা তারকারা তাই পিজিএ মেজর টুর্নামেন্টের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অলিম্পিককে। অনির্বাণ জানেন কী পরিমাণ লড়াই ও পাহাড় প্রমাণ চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া গেল ১৯৮২-তে প্রথম গলফ এশিয়ান গেমসে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর ঐতিহাসিক দিল্লী এশিয়াড থেকে এই কলকাতার ছেলে লক্ষ্মণ সিংহ সোনা তুলে নিয়েছিলেন। অনির্বাণ বেঙ্গালুরুবাসী হলেও তাঁর সঙ্গে যে নাড়ির যোগ কলকাতার। তাই তাঁর যে কোনো আন্তর্জাতিক কীর্তি ও গরিমার সঙ্গে যে বাঙালিয়ানার রোমান্টিক আবেগটুকুও বর্ণময় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পিজিএ মেজর চাম্পিয়নশিপে বিশ্বসেরা গলফারদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছেন। এই টুর্নামেন্টের 'স্টেজ রিহার্সাল' টেস্ট কার্নিভালে কিংবদন্তী জ্যাক নিকোলাসকে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন। বিশ্বের সর্বাধিক 'মেজর' জিতে নিকোলাস ইতিমধ্যেই 'গিনেস বুক অব রেকর্ডে' এলিট তালিকাভুক্ত।

এই টুর্নামেন্টের পরপরই অনির্বাণ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৮তম স্থানে উঠে এসেছেন। তাঁর আসল লক্ষ্য ২০১৬-র অলিম্পিকে ভাল ফল করার পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে ঢুকে পড়া। আর যুক্তরাষ্ট্র পিজিএ-তে ভাল পারফরমেন্সের দৌলতে মর্যাদামণ্ডিত প্রেসিডেন্টস কাপে বিশ্ব দলে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ঘটে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিশ্ব টিম ম্যাচে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডিংয়ে সাত নম্বর র‍্যাঙ্কিং পেয়ে দলভুক্ত হয়েছেন অনির্বাণ।

প্রেসিডেন্টস কাপ ম্যাচের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামা।

শব্দরূপ-৭৬৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

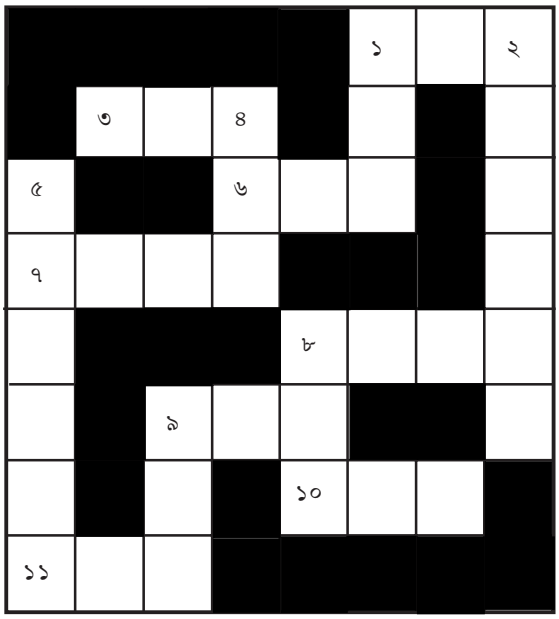

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পুরাণোক্ত মুনি যাঁর অস্থিতে বজ্র নির্মিত হয়েছিল, **৩.** রাম কর্তৃক স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে নিহত রাক্ষস, **৬.** কলিকা, মুকুল, কুঁড়ি, **৭.** যার পেট বড়; গণেশ, **৮.** রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, **৯.** 'মশা মারতে—দাগা' (প্রবচন), **১০.** শিবপার্বতীর পুত্র, দেবসেনাপতি, **১১.** তৃণধান্য।

উপর-নীচ : ১. যথাবিধি গৃহীত পোষ্যপুত্র, **২.** মনোরঞ্জন, **৪.** পক্ষীবিশেষ (প্রবাদ—জ্যোৎস্না পান করে), **৫.** তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে উক্ত দেহের অভ্যন্তরে মূলাধার পদ্মে স্থিত শিবশক্তি, **৮.** হিমালয়পত্নী, উমার মাতা, **৯.** 'দুর্গম গিরি, — মরু, দুস্তর পারাবার হে'।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুন্দররাম হাসদা
বান্দোয়ান, পুরুলিয়া

রে	■	■	বি	স্ব	কো	ষ	■
কা	■	■	দু	■	মো	■	■
বি	শ্ব	ম্ভ	র	■	দ	■	■
■	স	■	■	উ	কী	ল	■
■	ন	বি	স	■	■	লা	■
■	■	শ্বা	■	অ	ন	ট	ন
■	■	মি	■	রি	■	■	বো
■	য	ত্র	ত	ত্র	■	■	ঢ়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৬৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৬

পাকিস্তানে ধুঁকছে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংরক্ষণ ও সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে পাকিস্তানে অবস্থিত হিন্দু মন্দির ও বিভিন্ন বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলি। যথাযথ সংরক্ষণ না করে

অভিসন্ধিমূলক ভাবে পাকিস্তান এই ঐতিহ্যগুলিকে নষ্ট করতে চাইছে বলে অনেকে মনে করছেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৪৭ সালের আগে পাকিস্তানে হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ স্তূপ, মঠের সংখ্যা সব মিলিয়ে দু' হাজারেরও বেশি ছিল। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে দু'শোরও কম।

ইউনেস্কো দ্বারা ঘোষিত পাকিস্তানের 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্থানগুলিকে এক সময় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা এখন থমকে আছে। পাকিস্তানে অবস্থিত এই সমস্ত মঠ মন্দিরগুলি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। এই সংস্থাগুলি তাদের সঠিক ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ।

বিদেশি বন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাপ্তসূত্র অনুযায়ী ৬০০০-এর বেশি বিদেশি নাগরিক ভারতের জেলগুলিতে বন্দী রয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বন্দীই হলো বাংলাদেশি। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গেই বিদেশি বন্দীর সংখ্যা সব থেকে বেশি। মোট ২৯৩৫। এই বন্দীদের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত ১১১৩ ও বিচারাধীন ১৮২২। সারা ভারতে সাজাপ্রাপ্ত বিদেশি বন্দীর সংখ্যা ২৪৯৫, বিচারাধীন ৩৫৭৬। এন সি আর বি ডাটা ফর ২০১৪— ৩১ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

ফরাক্কা এন টি পি সি-র অমানবিক আচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৭ জুন ১২ জন মেইন্টেনেন্স শ্রমিককে ফরাক্কা এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ বে-আইনি ভাবে ব্ল্যাক লিস্ট ভুক্ত করে রেখেছে। শ্রমিকদের অপরাধ তারা তাঁদের নায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছেন। উল্লেখ্য, ২৬ মে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রেকানউদ্দীন শেখ নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হলে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। স্থানীয় বিডিও এবং আই সি-র মধ্যস্থতায় এন টি পি সি চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণে রাজি হলেও এখনও ক্ষতিপূরণের সমস্ত প্রাপ্য টাকা কর্তৃপক্ষ মৃতের পরিবারকে দেয়নি।

নবগঠিত ফরাক্কা এফ এস টি পি এস অরাজনৈতিক শ্রমিক ইউনিয়নের দাবিতে এই প্রথম ক্ষতিপূরণে রাজি হয় এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ। এদিকে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ইউনিয়নগুলি নতুন ইউনিয়ন যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেজন্য এন টি পি সি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে ১২ জনের গেটপাশ আটকে রেখেছে। এই ১২টি পরিবার ভীষণ অসহায় এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রে 'স্বচ্ছতা দূত' তিন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গ্রামীণ এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানের জন্য 'স্বচ্ছতা দূত' হিসেবে তিনজন মহিলাকে নিয়োগ করল মহারাষ্ট্র সরকার। যারা রাজ্য জুড়ে খোলা জায়গায় শৌচকর্মের মতো খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য সচেতনতা গড়ে তুলবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বর্ষপূর্তিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মহারাষ্ট্র সরকার। সেখানেই চৈতালী রাঠোর, সঙ্গীতা আভাডে ও সুবর্ণা লোখণ্ডে নামে তিন মহিলাকে অভিনন্দিত করেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। 'স্বচ্ছতা দূত' হিসেবে নিযুক্ত এই তিন মহিলাই নিজস্ব প্রেরণায় স্বচ্ছতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখেছেন। কেউ গয়না বেচে তৈরি করেছেন শৌচালয়, কেউবা বিয়েতে যৌতুক হিসেবে নিয়েছেন শৌচালয়। আবার কেউ শৌচালয় নির্মাণ করেছেন স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীশ বলেন, এই তিন মহিলা আমাদের কাছে প্রেরণার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
12 October - 2015 - Rs. 10.00
Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দাম : ১০.০০ টাকা